১২ মাসে
১৩ পর্ব

ঈদ হল দ্বীনী বিষয়

প্রত্যেক জাতির ঈদ হল খুশী ও আনন্দের দিন। যে খুশী বছর, মাস অথবা সপ্তাহান্তে একবার করে বারবার ফিরে আসে। ঐ দিনে লোকেরা এক স্থানে সমবেত হয় এবং বিশেষ ইবাদত অথবা লোকাচার বা দেশাচার পালন করা হয়।

ইসলামে ঈদ কিন্তু মুসলিমদের মনগড়া কিছু নয়। ঈদের দিন ও স্থান উভয়ই নির্ধারিত হয় মহান প্রতিপালকের তরফ থেকে। যেহেতু ঈদের বিধানও এসেছে বিধানকর্তা আল্লাহর তরফ থেকে।

মহানবী ﷺ মদীনায় আগমন করলে দেখলেন, মদীনাবাসীরা দুটি ঈদ পালন করছে। তা দেখে তিনি বললেন, (জাহেলিয়াতে) তোমাদের দুটি দিন ছিল যাতে তোমরা খেলাধূলা করতে। এক্ষণে ঐ দিনের পরিবর্তে আল্লাহ তোমাদেরকে দুটি উত্তম দিন প্রদান করেছেন; ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিন।' *(সহীহ আবূ দাউদ ১০০৪, নাসাঈ ১৫৫৫নং)*

জাহেলী যুগের ঈদকে বাতিল করে তার পরিবর্তে ইসলামী ঈদ বহাল করার মানেই হল, মুসলিম জাতি ঈদের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশের অনুসারী এবং সে ব্যাপারে তাদের নিজস্ব কোন এখতিয়ার নেই অথবা দেশাচার বা লোকাচার বলে তা পালন করার কোন অধিকার নেই।

প্রত্যেক জাতির ঈদ ভিন্ন। মহান আল্লাহ প্রত্যেক জাতির জন্য পৃথক পৃথক ইবাদতের নিয়ম-কানুন দিয়েছেন। আমাদের বাৎসরিক ঈদ অন্যান্য জাতি থেকে পৃথক, সাপ্তাহিক ঈদ খাস ইবাদতের দিন অন্যান্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র। আমাদের কিবলা পৃথক, নামায, রোযা, হজ্জ ও অন্যান্য ইবাদত অন্যদের থেকে আলাদা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾

অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছি নিয়ম-কানুন;

যা তারা পালন করে। *(সূরা হাজ্জ ৬৭ আয়াত)*

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে। আর এ হল আমাদের ঈদ।" *(বুখারী ৯৫২, মুসলিম ৮৯২নং)*

বলাই বাহুল্য যে, ঈদ যদি দ্বীনের অংশ হয়, তাহলে তাতে কিছু সংযোজন করা এবং নতুন ঈদ আবিষ্কার করা অবশ্যই বিদআত।

কিছু লোক আছে যারা দ্বীন পালন করে কেবল খুশীর বিষয়কে কেন্দ্র করে। খুশীর বিষয় হলে এরা প্রথম সারিতে থাকে; কষ্টের বিষয়ে পিছপা থাকে। এরা দ্বীনকে কেবল খেল-তামাশার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে। এই ধরনের এক শ্রেণীর মানুষদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَنَادَىٰٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا۟ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾ ﴾ (الأعراف ٥٠-٥١)

অর্থাৎ, জাহান্নামবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ জীবিকারূপে তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা হতে আমাদেরকে কিছু দাও।' জান্নাতীরা উত্তরে বলবে, 'আল্লাহ এ দুটিকে অবিশ্বাসীদের (কাফেরদের) জন্য হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন। যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল। *(সূরা আ'রাফ ৫০-৫১ আয়াত)*

দুনিয়াতে স্বার্থপর কিছু লোক আছে, যারা হালোয়া খাওয়ার পরবে থাকে, কিন্তু স্বার্থত্যাগের পরবে থাকে না। যারা আন্ডা খাওয়ার বেলায় আছে, ডান্ডা খাওয়ার বেলায় নেই।

পরব সৃষ্টির কারণ

অতিরিক্ত পরব সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান কারণ হল, আনন্দ উপভোগ। দ্বিতীয় কারণ হল শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতা। আর তৃতীয় কারণ হল, বিজাতির অনুকরণ।

মুসলিম এমন এক জাতি, যার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করে কোন মুসলিম বিজাতির বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে পারে না অথবা নিজস্ব কল্পিত ও স্বরচিত কোন বৈশিষ্ট্যের অনুসারী হতে পারে না। মুসলিম কোন বিজাতির আদর্শ গ্রহণ করতে পারে না। সে তো নিজের দ্বীন, চরিত্র ও আদর্শ নিয়ে গর্ব করে। ভ্রষ্টদের কাছে তা ধার করতে যাবে কেন?

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ বিধানের উপর, সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। *(সূরা জাষিয়াহ ১৮ আয়াত)*

﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴾

অর্থাৎ, তোমার জ্ঞান-প্রাপ্তির পর তুমি যদি ওদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না। *(সূরা রা'দ ৩৭ আয়াত)*

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ (المائدة ٥١)

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো

না, তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই একজন গণ্য হবে। অবশ্যই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না। *(সূরা মাইদাহ ৫১ আয়াত)*

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ (المجادلة ٢٢)

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা আল্লাহ ও তার রসূলের বিরুদ্ধাচারীগণকে ভালোবাসে, যদিও সে (বিশ্বাসী) তাদের পিতা অথবা পুত্র, ভ্রাতা অথবা একান্ত আপনজন কেউ হয়----। *(সূরা মুজাদালাহ ২২ আয়াত)*

যেহেতু মুসলিম উম্মাহর আদর্শ হলেন শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল ﷺ। আর তিনি বলেন,

"যে ব্যক্তি বিজাতির তরীকা অনুযায়ী আমল করে, সে আমাদের কেউ নয়।" *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪নং)*

"আমাদের তরীকা ওদের (মুশরিকদের) তরীকা থেকে ভিন্ন।" *(বাইহাকী ৫/১২৫)*

"যে ব্যক্তি যে জাতির আনুরূপ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।" *(আহমাদ ২/৫০, আবূ দাঊদ ৪০৩১, সহীহুল জামে' ৬০২৫ নং)*

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, উক্ত হাদীসের সর্বনিম্ন দাবী হল, কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন হারাম; যদিও তার প্রকাশ্য অর্থ দাবী করে যে, সাদৃশ্য অবলম্বনকারী কাফের হয়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহর এই বাণী "যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদেরই একজন" ঐ কথাই দাবী করে।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন, 'যে ব্যক্তি মুশরিকদের দেশে ঘর বানায়, তাদের 'নওরোজ' ও 'মাহারজান'[1] পালন করে এবং তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে

---

[1] 'নওরোজ' হল, কিবতী (মিসরী খ্রিষ্টানদের) নববর্ষের প্রথম দিন। আর 'মাহারজান' হল, পারসীকদের ঈদ।

থাকা অবস্থায় মারা যায়, সে ব্যক্তির হাশর তাদেরই সাথে হবে।' *(বাইহাকী ৯/২৩৪)* এই উক্তিকে সাধারণ (সার্বিক) সাদৃশ্য অবলম্বনের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ, সার্বিকভাবে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন অবশ্যই কুফরী। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু কিছুভাবে করলে তা হারাম হওয়ারই দাবী রাখে। অবশ্য এ কথাও ধরে নেওয়া যায় যে, যে ধরন ও বিষয়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হবে, তার মানও হবে সেই অনুযায়ী। যে বিষয়ে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হবে, তা যদি কুফ্র অথবা পাপ অথবা তার প্রতীক হয়, তাহলে তার মানও হবে তারই অনুরূপ। *(ইক্বতিযা ১/২৪১-২৪২)*

কাদের মত হওয়া নিষেধ?

যারাই ইসলামের শত্রু, ইসলাম-বিরোধী, ইসলাম অস্বীকারকারী, কাফের, মুনাফিক, ফাসেক বা বিদআতী তাদেরই অনুকরণ মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

মহানবী ﷺ আমাদেরকে কাফেরদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন। একদা মহানবী ﷺ আব্দুল্লাহ বিন আমর ؓ কে দু'টি জাফরান রঙের কাপড় পরে থাকতে দেখে বললেন, "এ ধরনের কাপড় হল কাফেরদের। অতএব তুমি তা পরো না।" *(মুসলিম, আহমাদ ২/১৬২)*

তিনি নিষেধ করেছেন মুশরিকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُوا۟ وَٱخْتَلَفُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হবে না, যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়ে (দলে দলে বিভক্ত হয়ে) পড়েছে এবং নিজেদের মাঝে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। *(সূরা আ-লি ইমরান ১০৫ আয়াত)*

মুসলিমরা সিজদাহ করে কেবল আল্লাহকে, নামায পড়ে কেবল তারই জন্য;

সূর্যের জন্য নয়। তবুও সূর্যের উদয়-অস্তকালে কোন নফল নামায পড়া যাবে না। কারণ তাতে মুশরিকদের সাদৃশ্য হয় তাই।

উক্ববা বিন আমের ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে তিন সময়ে নামায পড়তে এবং মুর্দা দাফন করতে নিষেধ করতেন; (১) ঠিক সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে একটু উঁচু না হওয়া পর্যন্ত, (২) সূর্য ঠিক মাথার উপর আসার পর থেকে একটু ঢলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং (৩) সূর্য ডোবার কাছাকাছি হওয়া থেকে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত। *(মুসলিম, আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১০৪০ নং)* যেহেতু এই সময়গুলিতে সাধারণতঃ কাফেররা সূর্যের পূজা করে থাকে তাই। *(মুসলিম, মিশকাত ১০৪২ নং)*

হজ্জ করতে গিয়ে মুশরিকরা আরাফাত থেকে সূর্য ডোবার আগে এবং মুযদালিফা থেকে সূর্য ওঠার পরে প্রস্থান করত। মহানবী ﷺ মুসলিমদেরকে তাদের বিরোধিতা করে আরাফাত থেকে সূর্য ডোবার পরে এবং মুযদালিফা থেকে সূর্য ওঠার আগে প্রস্থান করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ফারুক হযরত উক্ববাহ বিন ফারক্বাদকে নসীহত করে লিখেছিলেন, 'তোমরা বিলাসিতা, মুশরিকদের লিবাস ও রেশমবস্ত্র পরা থেকে দূরে থেকো।' *(মুসলিম ২০৬৯নং)*

ইসলামের প্রথম দিকে মহানবী ﷺ আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান)দের অনুরূপ কিছু আমল করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি নিষেধ করেছেন তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে।

তিনি বলেছেন, "সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তোমরা ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না, আর খ্রীষ্টানদেরও সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" *(তিরমিযী ২৬৯৫নং, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪নং)*

তিনি বলেন, "দ্বীন ততকাল বিজয়ী থাকবে, যতকাল লোকেরা ইফতার করতে তাড়াতাড়ি করবে। কারণ, ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা দেরী করে ইফতার করে।" *(আদাঃ, হাঃ, ইহিঃ, সজাঃ ৭৬৮-৯নং)*

তিনি ইয়াহুদীদের অনুকরণ করে আঙ্গুলের ইশারায় এবং খ্রিষ্টানদের অনুকরণ করে হাতের ইশারায় সালাম দিতে নিষেধ করেছেন। *(তিরমিযী ২৬৯৫নং)*

চুল-দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেলে সাদাই রেখে দেওয়া আহলে কিতাবের আচরণ। তাই ইসলামের আদেশ হল, তা কালো ছাড়া অন্য কোন রঙ্ দ্বারা রঙিয়ে ফেল এবং তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না। *(বুখারী ৩৪৬২, মুসলিম ২১০৩ নং, আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১০৬৭, ৪৮৮৭ নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও, মোছ ছেঁটে ফেল এবং সাদা চুল-দাড়ি রঙিয়ে ফেল। আর ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ১০৬৭ নং)*

শুধু তাই নয়, বরং মহান আল্লাহও আমাদেরকে তাদের মত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٥ ﴾
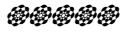
অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়ে গেছে এবং নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। *(সূরা আ-লে ইমরান ১০৫ আয়াত)*

﴿ أَلَمۡ يَأۡنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخۡشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلۡحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلُ فَطَالَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَمَدُ فَقَسَتۡ قُلُوبُهُمۡۖ وَكَثِيرٞ مِّنۡهُمۡ فَٰسِقُونَ ١٦ ﴾

অর্থাৎ, ঈমানদার ব্যক্তিবর্গের জন্য এখনো কি সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণ ও সত্য অবতীর্ণ হওয়ার ফলে তাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে উঠবে? আর তাদের মত হবে না, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলে তাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের

অধিকাংশই সত্যত্যাগী। *(সূরা হাদীদ ১৬ আয়াত)*

আর এ জন্যই মুসলিমরা প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাকআতে তাদের মত ও পথ থেকে দূরে থাকার দুআ করে থাকে মহান আল্লাহর দরবারে।

﴿ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧ ﴾

অর্থাৎ, আমাদেরকে সরল পথ দেখাও; তাদের পথ -যাদেরকে তুমি পুরস্কার দান করেছ। তাদের পথ নয় -যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) এবং যারা পথভ্রষ্ট (খ্রিষ্টান)। *(সূরা ফাতিহা ৬-৭ আয়াত)*

তিনি নিষেধ করেছেন অগ্নিপূজকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মোছ ছেঁটে ও দাড়ি রেখে অগ্নিপূজকদের বৈপরীত্য কর।" *(মুসলিম ২৬০ নং)*

এই অগ্নিপূজকদের অনুরূপ হবে বলেই আগুন সামনে রেখে নামায পড়াকে উলামাগণ অবৈধ মনে করেছেন।

তিনি নিষেধ করেছেন অনারবদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে।

আবূ উমামাহ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, "দাঁড়ায়ো না; যেমন অনারব (পারস্যের) লোক তাদের বড়দের তা'যীমে উঠে দাঁড়ায়।" *(আবূ দাঊদ ৫২৩০, ইবনে মাজাহ ৩৮৩৬নং, হাদীসটির সনদ যয়ীফ, কিন্তু অর্থ সহীহ, দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৩৪৬নং, অবশ্য সহীহ হাদীসে নামাযের ভিতরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।)*

শরীয়ত নিষেধ করেছে জাহেলী যুগের লোকদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে। কুরআন মুসলিম নারীদেরকে সম্বোধন করে বলে,

﴿ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ ﴾

অর্থাৎ তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং পূর্বের জাহেলী যুগের (মেয়েদের) মত বেপর্দায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়ায়ো না। *(সূরা আহযাব ৩৩ আয়াত)*

একদা হজ্জে গিয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ﷺ আহমাস গোত্রের যয়নাব নামক এক মহিলাকে লক্ষ্য করলেন, সে মোটেই কথা বলে না। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার, ও কথা বলে না কেন?' লোকেরা বলল, 'ও নীরব থেকে হজ্জ পালন করার নিয়ত করেছে।' তিনি সেই মহিলাকে সরাসরি বললেন, 'তুমি কথা বল। এমন কর্ম বৈধ নয়। এমন কর্ম জাহেলিয়াত যুগের!' এ কথা শুনে মহিলা কথা বলতে শুরু করল। *(বুখারী ৩৮৩৪ নং)*

শরীয়ত আমাদেরকে নিষেধ করেছে ফাসেক পাপাচারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا ٢٨ ﴾

অর্থাৎ, যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে উদাসীন করে দিয়েছি, যে তার খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করো না।" *(সূরা কাহফ ২৮ আয়াত)*

﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١٩ ﴾
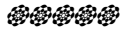
অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে আল্লাহও তাদের আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই তো সত্যত্যাগী। *(সূরা হাশ্‌র ১৯ আয়াত)*

শরীয়ত নিষেধ করেছে বেদুঈনদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে। *(বুখারী ৫৩৮, মুসলিম ৬৪৪নং)*

শরীয়ত নিষেধ করেছে নারী-পুরুষ একে অন্যের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে।

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ সেই পুরুষকে অভিশাপ করেন, যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং সেই নারীকে অভিশাপ করেন, যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে।" *(আবূ দাউদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৫০৯৫ নং)*

তিনি নিজেও পরস্পরের বেশধারী নারী-পুরুষকে অভিশাপ করেছেন। *(বুখারী ৫৮৮৫ নং, প্রমুখ)* এবং আরো বলেছেন যে, "সে পুরুষ আমাদের দলভুক্ত নয়,

যে কোন নারীর সাদৃশ্য অবলম্বন করে। অনুরূপ সে নারীও আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কোন পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৫৪৩৩ নং)*

তিনি বলেন, "পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, মেড়া পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারিণী মহিলা জান্নাতে যাবে না।" *(নাসাঈ, বাযযার, হাকেম ১/৭২, সহীহুল জামে' ৩০৬৩ নং)*

মানুষ একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীব। তাই তাকে নিষেধ করা হয়েছে শয়তানের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। *(সূরা বাক্বারাহ ২০৮ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার বাম হাতে পানাহার না করে। কারণ, শয়তান তার বাম হাত দিয়ে পানাহার করে থাকে।" *(মুসলিম ২০১৯, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৭৫৭৯ নং)*

নিষেধ করা হয়েছে সম্মানের অধিকারী মানুষকে জন্তু-জানোয়ারের অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন করতে। বস্তুতঃ যারা কান থাকতে ভালো কথা শোনে না, চোখ থাকতে ভালো জিনিস দেখে না এবং হৃদয় থাকতে ভালো কথা বুঝে না, সত্যপথের সন্ধান পায় না, তারা চতুষ্পদ জন্তু নয় তো কি? বরং সৃষ্টিকর্তার মন্তব্য অনুযায়ী তারা জন্তু থেকেও নিকৃষ্টতর।

কিন্তু হেদায়াতের আলোকপ্রাপ্ত মানুষ কোন জন্তুর অনুকরণ করতে পারে না। মহানবী ﷺ বলেন, যখন তোমাদের কেউ সিজদাহ করে তখন যেন উটের বসার মত না বসে। বরং তার হাঁটু রাখার আগে যেন হাতকে রাখে।" *(আহমাদ ২/৩৮১, আবূ দাউদ ৮৪০নং, নাসাঈ)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা সোজাভাবে সিজদাহ কর। তোমাদের মধ্যে

কেউ যেন কুকুরের মত দুই প্রকোষ্ঠকে বিছিয়ে না দেয়।” *(আহমাদ, বুখারী ৮২২, মুসলিম, আবূ দাউদ)* “তোমার দুই হাতের প্রকোষ্ঠকে হিংস্র জন্তুদের মত বিছিয়ে দিও না। দুই চেটোর উপর ভর কর ও পাঁজর থেকে (কনুই দু’টিকে) দূরে রাখ। এরূপ করলে তোমার সঙ্গে তোমার প্রত্যেক অঙ্গ সিজদাহ করবে।” *(ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম ১/২২৭)*

আবূ হুরাইরা ﵁ বলেন, আমার দোস্ত ﷺ আমাকে কুকুরের মত (দুই পায়ের রলাকে খাড়া রেখে, দুই পাছার উপর ভর করে ও হাত দু’টিকে মাটিতে রেখে) বসতে নিষেধ করেছেন। *(আহমাদ ২/২৬৫, ত্বায়ালিসী, ইবনে আবী শাইবাহ)*

আবূ হুরাইরা (অন্য এক বর্ণনায়) ﵁ বলেন, ‘আমার বন্ধু আমাকে নিষেধ করেছেন যে, আমি যেন মোরগের দানা খাওয়ার মত ঠক্‌ঠক্ করে নামায না পড়ি, শিয়ালের মত (নামাযে) চোরা দৃষ্টিতে (এদিক-ওদিক) না তাকাই, আর বানরের বসার মত (পায়ের রলা খাড়া করে) না বসি।’ *(আহমাদ ২/২৬৫, ত্বায়ালিসী, ইবনে আবী শাইবাহ)*
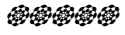
কোন্ বিষয়ে সাদৃশ্য অবলম্বন করব না

পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝা গেছে যে, বিজাতির অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন বৈধ নয়। কিন্তু কোন্ বিষয়ে এবং কোন্ ধরনের অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন?

এক প্রশ্নের উত্তর রয়েছে স্বয়ং মহানবী ﷺ-এর হাদীসে; তিনি বলেন, “যেভাবে (যত বিষয়ে) তোমাদের সাধ্য, তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরোধিতা কর।” *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, হিজাবুল মারআতিল মুসলিমাহ ৯৪পৃঃ)*

অন্তর থেকে না হলেও, বাহ্যিকভাবেও তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন বৈধ নয় মুসলিমের জন্য। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, ‘(বাহ্যিক) সাদৃশ্য অবলম্বন আভ্যন্তরিক প্রেম ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি করে। যেমন আভ্যন্তরিক প্রেম বাহ্যিক সাদৃশ্য অবলম্বনের ইচ্ছা সৃষ্টি করে।’ *(ইক্বতিযা ১/৪৮৮)*

বেদ্বীন প্রতিবেশী ও জাতির সহিত দেশীয় মিল থাকতে পারে, পার্থিব

লেনদেনে যোগাযোগ থাকতে পারে, সদাচার ও সদ্ব্যবহার থাকতে পারে। তা বলে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিকিয়ে দিয়ে একাকার হওয়া চলে না। পার্থিব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে আমরা যে কোন জাতির অনুকরণ করতে পারি। কিন্তু নিছক তাদের ধর্মীয় প্রতীক, বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ আচার-আচরণ ও লেবাস-পোশাকে আমরা তাদের অনুকরণ করতে পারি না। আমরা যে সব বিষয়ে বিজাতির অনুকরণ করতে পারি না, তার মধ্যে একটি হল,

(১) আকীদা ও বিশ্বাসগত বিষয় ঃ অর্থাৎ, তারা যে শির্কী ও কুফরী বিশ্বাস রাখে, সে বিশ্বাস কোন মুসলিম রাখতে পারে না। যে কুফরী মতবাদে তারা বিশ্বাসী সে মতবাদে কোন মুসলিম বিশ্বাসী হতে পারে না।

(২) ইবাদত ঃ তাদের ইবাদতের মত কোন ইবাদত, তাদের ইবাদতের সময়ে কোন ইবাদত মুসলিম করতে পারে না।

(৩) লেবাস-পোশাক ঃ পরিধানের কাটিং ও ধরনে মুসলিম তাদের অনুকরণ করতে পারে না।

(৪) আকার-আকৃতি ঃ চুল, চেহারা ও দৈহিক আকৃতিতেও মুসলিম স্বতন্ত্র।

(৫) ঈদ ও পাল-পার্বণ উৎসব উদ্‌যাপন ও অনুষ্ঠানগত বিভিন্ন বিষয়। তাতে বিজাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করা যাবে না। যেহেতু তাদের ঈদ কোন অমূলক ধারণা, বাতিল ও শির্কী বিশ্বাস ও কর্ম সম্বলিত হয়। বিদআতীদের ঈদেও বহু শির্ক ও বিদআতমূলক কর্মকান্ড থাকে, তাতে তা দুর্বল বা জাল হাদীস-ভিত্তিক হোক, অথবা নিছক মনগড়া।

এই পুস্তিকার আলোচ্য বিষয় এই শেষোক্ত সাদৃশ্যকে কেন্দ্র করেই।

বলাই বাহুল্য যে, নিষেধ সত্ত্বেও উম্মাহ নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হল না। তারা যে সক্ষম হবে না, তাও মহানবী ﷺ তাঁর অহীলব্ধ জ্ঞানে জানতে পেরেছিলেন। তাই তো তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেছিলেন, “অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি গো-সাপের (সান্ডা)র গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। (এবং তাদের

অনায়াসে বিস্তার লাভ করেছে এবং বিজাতীয় আচরণ প্রাধান্য পেয়েছে তার জীবনের পদে পদে।

পাশ্চাত্য-সভ্যতার ছোঁয়া লাগা মানুষ হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে পশ্চিমা-বিশ্বের অনুকরণ করে। কাফেরদের বিভিন্নমুখী বিভব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং পার্থিব উন্নয়ন দেখে মুসলিম নিজেদেরকে হেয় ও তুচ্ছজ্ঞান করে বসেছে। ভেবেছে, দুনিয়ায় ওরা যখন এত উন্নত, তখন ওদের সভ্যতাই হল প্রকৃত সভ্যতা। সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণে এটাই ধরে নিয়েছে যে, ওরা যেটা করে, সেটাই উত্তম ও অনুসরণীয়। ওদের মত করতে পারলে তারাও ঐরূপ উন্নতির পরশমণি হাতে পেয়ে যাবে। মনে করেছে যে, ওদের ঐ ছন্নছাড়া, লাগামছাড়া, বাঁধনহারা যৌন-স্বাধীনতাপূর্ণ জীবনই হল ওদের উন্নতির মূল কারণ এবং প্রগতির মূল রহস্য।

নিজের রূপ-গুণ ভুলে আছে, তাই তো এ জাতি অপরের রূপ-গুণে মুগ্ধ। অপরের গুণগানে পঞ্চমুখ। আল্লাহ এ জাতিকে হেদায়াত করুন। আমীন।

বিজাতির ঈদ-পরবে সাদৃশ্য অবলম্বন করার বিভিন্ন ধরন

১। তাদের ঈদ (পরব) অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া অথবা অংশ গ্রহণ করা।

বহু মুসলমানই বিজাতির শির্কী ঈদ-পরবে (মেলা-উরসে) স্ত্রী-পরিজন বা ছেলে-মেয়ে সহ উপস্থিত হয়ে থাকে এবং সেখানকার নানা মনোরঞ্জনমূলক প্রোগ্রাম দর্শন করে মনের তৃপ্তি অর্জন করে থাকে, সেখানে বিক্রিত জিনিসপত্র খরিদ করে থাকে, মিষ্টান্ন খেয়ে ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য উপহার এনে থাকে।

অনেক ব্যবসায়ী দোকান দিয়ে বিভিন্ন পণ্য বিক্রয় করে থাকে। অনেকে সেখানে হারাম ও শির্কী অনুষ্ঠান দেখতে হাযির হয়। অনেকে সেই মেলার

কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে সঙ্গম করে, তাহলে তোমরাও তা করবে!)" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইয়াহুদ ও নাসারার অনুকরণ করার কথা বলছেন?' তিনি বললেন, "তবে আবার কার?" *(বুখারী, মুসলিম ২৬৬৯, হাকেম, আহমাদ, সহীহুল জামে' ৫০৬৭ নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "পূর্ববর্তী জাতির সকল আচরণ এই উম্মত গ্রহণ করে নেবে।" *(সহীহুল জামে' ৭২১৯ নং)*

সাহাবী হুযাইফা বিন ইয়ামান বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অবলম্বন করবে জুতার মাপের মত (সম্পূর্ণভাবে)। তোমরা তাদের পথে চলতে ভুল করবে না এবং তারাও তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলতে ভুল করবে না। এমন কি তাদের কেউ যদি শুকনো অথবা নরম পায়খানা খায়, তাহলে তোমরাও (তাদের অনুকরণে) তা খেতে লাগবে!' *(আল-বিদাউ অন্নাহয়ু আনহা, ইবনে অযযাহ ৭১পৃঃ)*

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কেন এ জাতি অপর জাতির অন্ধানুকরণ করছে?

যে জাতি অপরকে আকর্ষণ করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, সে জাতি অপরের দিকে আকৃষ্ট কেন হচ্ছে?

কোন অমুসলিম কি মুসলমানী নাম রাখে? কোন অমুসলিম কি মুসলমানী ঈদ পালন করে? কোন অমুসলিম কি মুসলমানী লেবাস-পোশাক, আচার-আচরণ ও ভাষা ব্যবহার করে? কোন অমুসলিম কি কোন মুসলিমের অনুকরণ করে? তাহলে মুসলিম কেন অমুসলিমের অনুকরণ করে?

আসলে এ জাতি নিজের সভ্যতা বিষয়ে অজ্ঞ, নিজের কৃষ্টি ও কালচার বিষয়ে উদাসীন, দ্বীন ও তার শিক্ষা থেকে বহু দূরে। তাই তো অপরের সৌন্দর্য তার চোখে ধরেছে।

আজ এ জাতির দিকে তাকালে যেন গোটা জাতিকে কাঠের গড়া একটা পুতুল মনে হয়। এ জাতি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অন্যান্য জাতির তুলনায় বহু দুর্বল, মানসিক দিক দিয়ে আগ্রাসন ও পরাজয়ের শিকার, আর অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধ-সামগ্রীর ব্যাপারেও বড় কমজোর। তাই বিজাতির প্রভুত্ব তার মনে-প্রাণে

মালিক, সেখানকার জায়গার মালিক, মেলার সভাপতি, সম্পাদক, সদস্য অথবা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে থাকে।

অনেকে বিজাতির উৎসবের সময় নতুন পোশাক পরে এবং আরো অন্যান্য সাজ-সজ্জা করে থাকে। উত্তম খানাপিনার ব্যবস্থা করে থাকে।

অনেকে সেই উপলক্ষ্যে বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে থাকে এবং ঐ দিনকে ছুটি মেনে থাকে।

অনেক মুসলমান বাড়ির আশেপাশের মেলাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য মেয়ে-জামাইকে খাস দাওয়াত দিয়ে থাকে এবং জামায়ের হাতে মেলা-খরচ দিয়ে মেলা দেখতে ও সেই সাথে শির্কী ও হারাম কাজে সহযোগিতা করে থাকে। মেলাতে না ডাকলে অনেক অভিমানী জামাই আবার গোঁসাও করে থাকে।

এইভাবে জেনে না জেনে তওহীদবাদীর ছেলেরা বাতিল ও শির্কের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

পক্ষান্তরে উপর্যুক্ত অভ্যাস রহমানের বান্দাদের নয়। মহান আল্লাহ বলেন,
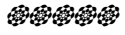
﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا ﴿٧٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা কোন বাতিলে অংশগ্রহণ করে না এবং কোন অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে ভদ্রের মত পার হয়ে যায়। *(সূরা ফুরকান ৭২ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে 'বাতিল'-এর তফসীরে অনেক মুফাসসিরীনে কিরাম বলেছেন, তা হল বিজাতির পরব বা মেলা।

বলাই বাহুল্য যে, শির্কী কোন অনুষ্ঠান বা মেলাতে অংশগ্রহণ করা ইসলামী শরীয়ত-বিরোধী। আর এ জন্যই উম্মাহর সলফগণ নিজে ঐ শ্রেণীর কোন অনুষ্ঠান বা মেলাতে শরীক হতেন না এবং অপরকে শরীক হতে মানাও করতেন।

উমার ফারুক ﷺ বলেন, '(অপ্রয়োজনে) অনারবের ভাষা শিখো না এবং মুশরিকদের পরবের দিনে তাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করো না। যেহেতু তাদের উপর আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হয়।'

ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, 'ওরা ওদের ঈদ পালনের জন্য যে নৌযানে চড়ে, সে নৌযানে চড়া মকরূহ। যেহেতু ওদের উপর (আল্লাহর) গযব ও অভিশাপ অবতীর্ণ হয়।' *(আল-লাম' ফিল হাওয়াদিষি অল-বিদ' ১/২৯৪)*

আম্র বিন মুর্রাহ বলেন, 'রহমানের বান্দারা শির্কী ব্যাপারে মুশরিকদের সহযোগিতা করে না এবং (তাদের ঐ শির্কী অনুষ্ঠানে) তাদের সাথে নিজেকেও মিশিয়ে দেয় না।' *(ইক্বতিযা ১/৪২৭)*

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'মহান আল্লাহ তাদের ঈদ-অনুষ্ঠানকে 'বাতিল' বলে আখ্যায়ন করেছেন এবং রহমানের বান্দাদেরকে সেখানে উপস্থিত হতে ও তা দর্শন করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যদি সেখানে উপস্থিত হওয়া ও তা দর্শন করা বৈধ না হয়, তাহলে তাতে অংশগ্রহণ করা এবং তাতে সহমত পোষণ করা কি হতে পারে?' *(ঐ ১/৪২৬)*

ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন, 'আল্লাহ তাদের ঈদ-অনুষ্ঠানকে 'বাতিল' বলে অভিহিত করেছেন। আর বাতিলকে সাহায্য (সাফল্যমন্ডিত) করা বৈধ নয়।' *(আহকামু আহলিয যিম্মাহ ৩/১২৪৪)*

বিজাতির শির্কী মেলা-অনুষ্ঠানে শরীক হওয়াতে, তাদের কুফরী ও শির্কের প্রতি সমর্থন প্রকাশ পায় অথবা অনেকাংশে তাতে সরাসরি যোগদান করা হয়। আর তাতে যে মানুষ কাফের হয়ে যেতে পারে, তার আশঙ্কাই অধিক।

বলাই বাহুল্য যে, মুসলিমের উচিত প্রত্যেক শির্কী আড্ডা থেকে দূরে থাকা। এমন কি আল্লাহর ওয়াস্তে কোন আমল করলেও এমন জায়গায় তা করা উচিত নয়, যেখানে শির্কী কোন গন্ধ পাওয়া যায়।

ষাবেত বিন যাহ্হাক ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় এক ব্যক্তি নযর মানল যে, সে বুয়ানাহ নামক জায়গায় একটি উট কুরবানী (নহর) করবে। সুতরাং লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে এসে সে কথা উল্লেখ করল (এবং সে নযর পালন করতে কোন বাধা আছে কি না, তা জানতে চাইল)। নবী ﷺ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন? "সেখানে কি জাহেলী যুগের কোন পূজ্যমান প্রতিমা ছিল?" লোকেরা বলল, 'জী না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,

“সেখানে কি সে যুগের কোন ঈদ (মেলা) হত?” লোকেরা বলল, ‘জী না।’ আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “তাহলে তুমি তোমার নযর পালন কর। যেহেতু আল্লাহর নাফরমানী করে কোন নযর পালন করা যাবে না এবং আদম সন্তানের সাধ্যের বাইরে মানা কোন নযর পালন করতে হয় না।” *(আবূ দাঊদ ৩৩১৩নং, ত্বাবারানী)*

প্রণিধানযোগ্য যে, যেখানে এক কালে বিজাতির শির্কী ঈদ বা মেলা হত, বর্তমানে হয় না, সেখানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা যদি বৈধ না হয়, তাহলে সেখানকার শির্কী মেলাতে অংশগ্রহণ করা অথবা কোন শির্কী কাজের কোন ভূমিকা পালন করা কি করে বৈধ হতে পারে? আল্লাহ এ জাতিকে সুমতি দিন। আমীন।

২। তাদের পরব-অনুষ্ঠান মুসলিম-সমাজে প্রচলন করা

অমুসলিমদের বা বিদআতীদের পরব মুসলিম বা সুন্নীদের দেশ, শহর, গ্রাম, পরিবেশ বা সমাজে নতুন করে প্রচলন করে অনেক মুসলিম নামধারী মানুষ এবং অনেক বিদআতীর আত্মীয় অথবা সুন্নীর ঘরে বিদআতী গ্রামের জামাই বা বউরা। অজ্ঞ লোকেরা তা নিজেদেরই দ্বীনের কোন অংশ মনে করে বরণ করে নেয় এবং শুরু হয় সেই পরব। আর এ কাজ; অর্থাৎ প্রচলন ও বরণ উভয়ই যে হারাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অনেক বেদ্বীন সরকারও সেই সব ঈদকে অধিকাংশ জনমতকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের দেশে চালু করে থাকে। সেই দিনকে সরকারী ছুটি হিসাবে ঘোষণা করে থাকে। রেডিও-টিভিতে সম্প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থা করে ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে এ সকল কাজও বিজাতির অন্ধানুকরণের পর্যায়ভুক্ত।

৩। তাদের পরবে তাদের বিশেষ কাজে তাদের অনুরূপ করা

অনেক নাদান মুসলমান আছে, যারা জেনে অথবা না জেনে বিজাতির পরব পালন না করলেও ঐ দিনে তারা যা করে তার কিছু কিছু আমল করে থাকে। যেমন; রাখি-বন্ধনের দিন হাতে রাখি বাঁধে, ---- গরু-ছাগলের গায়ে ছাপ দেয়, বিশ্বকর্মার দিন লোহার যন্ত্রপাতি বা গাড়িতে ফুল বা ধূপ দেয় অথবা তা বন্ধ

রাখে, শোকপালনের দিন কালো পোশাক পরে, এপ্রিল-ফুলের দিন শিক্ষকদের সাথে উপহাস করে, নববর্ষের কার্ড বিনিময় করে, মাতৃদিবস ও বিশ্ব ভালোবাসা দিবস পালন করে, বসন্ত উৎসব ও বিভিন্ন জয়ন্তী পালন করে ইত্যাদি।

ইমাম মালেক (রঃ)-এর অনেক অনুসারী বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি নওরোজের দিন তরমুজ ভাঙ্গল, সে যেন শূকর যবাই করল।’ *(আল-লাম' ফিল হাওয়াদিষি অল-বিদ্' ১/২৯৪)*

৪। পরবের দিনে তাদেরকে উপহার-উপঢৌকন দেওয়া, তাদের পরবে কোন প্রকার সহযোগিতা করা, গাড়ি বা বাড়ি ভাড়া দেওয়া, তাদের অনুষ্ঠানের আসবাব-পত্র বা সরঞ্জাম ধার দেওয়া বা বিক্রয় করা।

অনেকে বন্ধুত্ব বা প্রতিবেশের খাতিরে বিজাতির শির্কী ঈদ-পরবে তাদেরকে বিভিন্ন উপহার দিয়ে থাকে। তাদের অনুষ্ঠানের অনেক প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে; যেমন তাদের অনুষ্ঠানের জন্য গাড়ি, প্যান্ডেল, ঘর বা অন্য কিছু ভাড়া দিয়ে থাকে। তাদের শির্কী বা পাপাচারমূলক অনুষ্ঠানে ব্যবহারযোগ্য আসবাব-পত্র, মিষ্টান্ন, ফুল, গ্রীটিং-কার্ড বা সরঞ্জাম ইত্যাদি বিক্রয় করে থাকে। এমন সহযোগিতায় আসলে শির্ককেই সমর্থন ও সহযোগিতা করা হয়, তাই তা করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা সৎ ও তাকওয়ার কাজে একে অন্যের সহযোগিতা কর এবং পাপ ও অন্যায় কাজে একে অন্যের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। *(সূরা মাইদাহ ২ আয়াত)*

৫। যে মুসলিম তাদের আনুরূপ্য করতে চায়, তাতে তার সহযোগিতা করা।

যেমন বিজাতির ঈদ উপলক্ষ্যে যদি কোন মুসলিম দাওয়াত বা পার্টি দেয়, নিজের বিবাহ-বার্ষিকী বা ছেলে-মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে দাওয়াত দেয়, তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ নয়।

বৈধ নয় ঈদে-মীলাদ উপলক্ষ্যে কৃত দাওয়াত গ্রহণ করা। এমন দাওয়াতে গিয়ে লোককে দুটো ভালো কথা শোনাবার উদ্দেশ্যেও তা গ্রহণ করা এবং মীলাদ অনুষ্ঠানে শরীক হওয়া বৈধ নয়। কারণ তাতে বিদআতের সমর্থন ও সহযোগিতাই হয়ে থাকে। অবশ্য মান্যবর বক্তা হলে এবং তাঁর কথা মানুষে মানবে বলে প্রবল ধারণা হলে সে মজলিসে পৌঁছে দু' কথার সাথে এও বয়ান করে দেওয়া জরুরী যে, ঈদে মীলাদ ও সে উপলক্ষ্যে এই ধরনের অনুষ্ঠান-সভা বিদআত। কিন্তু সর্বাগ্রে এ কথার খেয়াল রাখতে হবে যে, হক বায়ান করতে গিয়ে যেন কোন প্রকার ফিতনা শুরু না হয়ে যায়। নচেৎ সেখানে উপস্থিত হওয়াই বৈধ নয়। *(ফাতাওয়াল লাজনাহ ৩/২৬)*

যেমন সেখানকার বিতরিত মিঠাই আদি খাওয়া বা আর অন্য কোনভাবে সে অনুষ্ঠানের সহায়তা ও সমর্থন করা বৈধ নয়।

৬। তাদের ঈদ বা পরব উপলক্ষ্যে তাদেরকে মুবারকবাদ দেওয়া।

এ ব্যাপারে শায়খ ইবনে উষাইমীন (রঃ) বলেন, ক্রিসমাস ডে' অথবা অন্য কোন ওদের ধর্মীয় পর্ব ও খুশিতে কাফেরদেরকে মুবারকবাদ দেওয়া সর্ববাদিসম্মতিক্রমে অবৈধ। যেমন ইবনুল কাইয়েম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থ 'আহকা-মু আহলিয যিম্মাহ'তে নকল করেছেন। তিনি বলেন, "বিশিষ্ট কুফরের প্রতীক ও নিদর্শনের ক্ষেত্রে মুবারকবাদ পেশ করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। যেমন ওদের ঈদ অথবা ব্রত উপলক্ষে মুবারকবাদ দিয়ে বলা, 'তোমার জন্য ঈদ মুবারক হোক', অথবা 'এই খুশিতে শুভাশীষ গ্রহণ কর' ইত্যাদি। এ কাজে যদিও সম্ভাষণদাতা কুফর থেকে বেঁচে যায়, তবুও তা হারামের অন্তর্ভুক্ত। আর এটা ওদের ক্রুশকে সিজদা করার উপলক্ষে মুবারকবাদ

দেওয়ার অনুরূপ। বরং এটা আল্লাহর নিকট গোনাহ এবং গযবের দিক থেকে মদ্যপান খুন, ব্যভিচার ইত্যাদির উপর মুবারকবাদ দেওয়ার চেয়ে অধিক বড় ও বেশী। বহু মানুষই যাদের নিকট দ্বীনের কোন কদর নেই তারা উক্ত পাপে পতিত হয়ে থাকে। কৃতকর্মের কুফলকে জানতে পারে না। উপরন্তু কোন মানুষকে পাপ, বিদআত অথবা কুফরের উপর মুবারকবাদ জানিয়ে থাকে, যখন সে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির শিকার হয়ে যায়।" *(ইবনুল কাইয়েমের উক্তি সমাপ্ত)*

কাফেরদের ধর্মীয় ঈদ-পর্বে তাদেরকে মুবারকবাদ দেওয়া এই লক্ষ্যেই হারাম যা ইবনুল কাইয়েম উল্লেখ করেছেন। যেহেতু তাতে কুফরী প্রতীকের উপর কাফেরদের প্রতিষ্ঠিত থাকাকে স্বীকার ও সমর্থন করা হয় এবং তাদের জন্য তাতে সম্মতি প্রকাশ করা হয়। যদিও সে এই কুফরী নিজের জন্য পছন্দ করে না; কিন্তু তবুও মুসলিমের জন্য কুফরীর প্রতীকে সম্মতি প্রকাশ অথবা তার উপর কাউকে মুবারকবাদ জানানো বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা ওতে সম্মত নন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা কাফের হলে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর দাসদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। যদি তোমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন। *(সূরা যুমার ৭আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى لَكُمُ وَرَضِيتُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ۚ ﴾

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীনরূপে মনোনীত করলাম। *(সূরা মা-য়েদাহ ৩ আয়াত)*

সুতরাং কুফরীর উপর ওদেরকে শুভাশীষ ও সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন হারাম-চাহে তারা ঐ ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী বা সঙ্গী হোক, চাহে না হোক।

আল্লাহই প্রার্থনাস্থল। তিনি মুসলিমদেরকে তাদের ধর্ম সহ সম্মানিত ও শক্তিশালী করুন। দ্বীনের উপর তাদেরকে দৃঢ়স্থিরতা দান করুন এবং তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করুন। নিশ্চয় তিনি মহাশক্তিমান পরাক্রমশালী। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্তে।

৭। তাদের ধর্ম বা ঈদ সংক্রান্ত বিশেষ নাম বা পরিভাষা ব্যবহার করা ঃ যেমন 'অমুক (স্থান) শরীফ', 'নওরোজ' 'হজ্জ-তীর্থ', নজরুল-জয়ন্তী প্রভৃতি।

৮। তাদের দেখাদেখি তাদের মত ঈদ ও পরব আবিষ্কার করা।

এমনও মুসলমান আছে যারা বিজাতির ঈদ-পরব পালন তো করে না, কিন্তু তাদের অনুকরণে ঈদ আবিষ্কার করে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। যেমন; যীশুর জন্মদিন পালন করতে দেখে 'ঈদে মীলাদুন্নাবী' আবিষ্কার ও পালন করে, রামলীলার অনুকরণে তা'যিয়া-মহরম, দেওয়ালীর অনুকরণে শবেবরাত ইত্যাদি মহাসমারোহে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান ও উদ্দীপনার মাধ্যমে পালন করে থাকে।

শুধু তাই নয়, তাদের অনুকরণে পালন করে থাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পর্যায়ের পালনীয় দিবস ও সপ্তাহ। যেমন; স্বাধীনতা-দিবস, গণতন্ত্র-দিবস, জাতীয়-দিবস, নজরুল-জয়ন্তী, মাতৃদিবস, বিশ্ব-ভালোবাসা-দিবস প্রভৃতি।

৯। জাহেলী যুগের যে সকল ঈদ ইসলাম বাতিল ঘোষণা করেছিল এবং মুসলিম সমাজ থেকে তা উঠে গিয়েছিল, তা পুনরায় তাজা ও জীবিত করে পালন করা।

নিঃসন্দেহে এমন কাজ হারাম ও ইসলাম-বিরোধী। মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সব মানুষের চাইতে বেশী ঘৃণিত; যে ব্যক্তি (মক্কা-মদীনার) হারাম সীমানার ভিতরে সীমালংঘন করে পাপ কার্য (ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি) করে, যে ব্যক্তি ইসলামে থেকে জাহেলী যুগের কৃষ্টি-তরীকা অনুসন্ধান করে এবং যে ব্যক্তি নাহক কোন মুসলিমকে খুন করার চেষ্টা করে।" *(বুখারী*

যখন ওরা ওদের ঈদ উপলক্ষে আমাদেরকে মুবারকবাদ জানায় তখনও আমরা তাদেরকে প্রত্যুত্তরে অভিবাদন জানাতে পারি না। যেহেতু তা আমাদের ঈদ নয়। আল্লাহ তাআলা এমন ঈদকে পছন্দ করেন না। কারণ, তা ওদের ধর্মে অভিনব রচিত কর্ম। অথবা বিধিসম্মত কিন্তু তা দ্বীন ইসলাম দ্বারা রহিত হয়ে গেছে, যে দ্বীন সহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করেছেন। যে দ্বীন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে। *(আ-লি ইমরান ৮৫)*

এই উপলক্ষে মুসলিমদের জন্য তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাও হারাম। যেহেতু দাওয়াত গ্রহণ মুবারকবাদ জ্ঞাপন অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। কারণ এতে ওদের ঈদে অংশ গ্রহণ করা হয়।

তদনুরূপ মুসলমানদের জন্য এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে, পরস্পরকে উপঢৌকন প্রদান করে, মিষ্টান্ন বিতরণ করে, বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বন্টন করে অথবা কর্মক্ষেত্রে ছুটি ঘোষণা করে কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা বৈধ নয়। কারণ নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের আনুরূপ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই দলভুক্ত।"

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর গ্রন্থ 'ইকতিযা-উস সিরাত্বিল মুস্তাকীম, মুখা-লাফাতু আসহা-বিল জাহীম'-এ বলেন, 'তাদের কিছু ঈদ-পর্বে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন, তারা যে বাতিলে অবিচলিত তাতে তাদের অন্তর খুশীতে ভরে ওঠার কারণ হবে এবং সম্ভবতঃ এই আনুরূপ্য তাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ও দুর্বলদেরকে অধীনস্থ করতে সহায়তা করবে।'

যে ব্যক্তি উপর্যুক্ত কিছু করে ফেলেছে সে গোনাহগার হবে। চাহে সে তা শিষ্টাচারিতা, বন্ধুত্ব, চক্ষুলজ্জা বা অন্য কিছুর খাতিরে করুক না কেন। যেহেতু এমন করা আল্লাহর দ্বীনে তোষামোদ করা, কাফেরদের আত্মা-মনকে সবল করে তোলা এবং তাদের ধর্ম নিয়ে গর্ব করার উপকরণের অন্তর্ভুক্ত।

৬৮৮-২নং)

জাহেলী যুগের কৃষ্টি বা তরীকা বলতে, সে যুগের সকল অপসংস্কৃতির কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন সে যুগের কন্যা হত্যা করা, অনেক কিছুকে অশুভ লক্ষণ মানা, হাত গণনা, মাতম করা, জুয়া খেলা, নওরোজ পালন করা প্রভৃতি।

ইসলাম গ্রহণের পরও যারা বসন্তোৎসব প্রভৃতি জাহেলী যুগের ঈদ পালন করে তাদেরকে আপনি আর কি মুসলমানই বা বলবেন?

১০। ইসলামী ঈদকে অমুসলিমদের ঈদের রূপদান করা।

ইসলামী ঈদ হল ইবাদতের দিন, মহান সৃষ্টিকর্তার জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপনের দিন, তকবীর-তসবীহ ও তহমীদ পাঠের দিন, গরীব-মিসকীনদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদেরকে ঐ খুশীতে শরীক করার দিন, বৈধ খেলা তথা জিহাদী খেলা খেলার দিন।

কিন্তু বহু নামধারী মুসলমান ঐ পবিত্র ও বর্কতময় ঈদকে নিছক বিজাতির ঈদের মত করে পালন করে থাকে; তাতে নানান পান-ভোজনের অপচয় ঘটিয়ে থাকে, গরীব-মিসকীনদের খেয়াল রাখে না, ঐ দিনে নানান রঙ্-তামাশায় মেতে ওঠে, সিনেমা দেখে, নির্লজ্জ যুবক-যুবতীর অবাধ মিলামিশার সাথে নানা অনুষ্ঠান করে, গান-বাজনা করে, ফটকা ও আতশবাজী করে।

এমন ঈদ -যে ঈদ ইসলাম-বিরোধী কর্মকান্ডে পরিপূর্ণ তা- কি ইসলামী ঈদ হতে পারে? এমন দুনিয়াদার বিজাতির তাবেদার 'দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও-দাও ফূর্তি কর'-মার্কা মুসলিমদেরকে আপনি আর কিই বা বলবেন?

এক শ্রেণীর মুসলমান ঈদের দিন বিজাতির অনুকরণে কোন্ শ্রেণীর উৎসবে মেতে যায়, তার একটা চিত্র এঁকেছেন কবি নজরুল তাঁর 'নওরোজ' কবিতায়,

'রূপের সওদা কে করিবি তোরা আয় রে আয়,
নওরোজের এ মেলায়!
ডামাডোল আজি চাঁদের হাট,
লুট হ'ল রূপ হ'ল লোপাট!
খুলে ফেলে লাজ-শরম-ঠাট্

রূপসীরা সব রূপ বিলায়
বিনি-কিম্মতে হাসি-ইঙ্গিতে হেলাফেলায়!
নওরোজের এই মেলায়!'

বার চাঁদের মনগড়া ফযীলত

বার মাসে তের পরবের একটি প্রভাবশালী কারণ হল হুযুরদের বার মাসের পৃথক অগণিত ফাযায়েল বর্ণনা করে মানুষকে বিদআত করতে উদ্বুদ্ধ করা। সাধারণ মানুষের আর কি দোষ? তারা হুযুরদের কিতাবে যা পড়বে এবং বক্তৃতায় যা শুনবে তাই তো আমল করবে। এমন অন্ধভক্তি ও অন্ধানুকরণে পড়ে বিদআত বেড়েছে, বেড়েছে নানা পাল-পার্বণ।

আসুন! আমরা এবার সেই ফযীলতের বয়ান দেখি। তবে তার আগে স্মরণ করিয়ে দিই যে, যে কোনও ইবাদতের সহীহ দলীল না থাকলে তা বিদআত।

মুহার্রাম মাস

মুহার্রম মাসের রোযা রাখার কথা এবং বিশেষ করে এ মাসের ৯ ও ১০ তারীখে রোযা রাখার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু তার অতিরিক্ত ফযীলত যে কোন্ ধরনের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তা আমার জানা নেই।

"যে ব্যক্তি মুহর্রম মাসের প্রথম ১০ দিন রোযা রাখে, সে যেন দশ হাজার বছর দিনে রোযা ও রাত্রে নফল ইবাদত করল, এ পরিমাণ সওয়াব তার আমল-নামায় লিখা হবে।" "এই মাসে ইবাদত করলে শবেকদর রাত্রে ইবাদত করার মত সওয়াব লাভ হয়।"--- ইত্যাদি হাদীস কোথায় আছে এবং তার মান কি তা আপনি আপনার হুজুরকে জিজ্ঞাসা করুন। জিজ্ঞাসা করুন নিম্নের নামায ও তার খেয়ালী সওয়াব লাভের দলীল।

মহরম মাসের প্রথম তারীখের রাতে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১১ বার।

এই রাতে আরো ৬ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১০ বার। এতে বেহেশ্তে ২০০০ মহল লাভ হবে; প্রত্যেক মহলে ইয়াকূতের ১০০০ দরজা এবং প্রত্যেক দরজায় সবুজ রঙের তখতার উপর হুর বসে থাকবে। ৬০০০ বালা দূর হবে এবং ৬০০০ সওয়াব লাভ হবে!

এই তারীখে দিনে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৩ বার। এতে দু জন ফিরিশ্তা বডিগার্ড পাওয়া যায় এবং সারা বছর শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ।

আশুরার রাতে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৩ বার। এতে কিয়ামত পর্যন্ত রৌশন থাকবে।

এই রাতে আরো ৪ রাকআত। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫০ বার। এতে ৫০ বছরের আগের ও পরের গোনাহ মাফ হয়!

আশুরার দিনে ৪ রাকআত নামায; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫০ বার। এতে ৫০ বছরের আগের ও পরের গোনাহ মাফ হয়! বেহেশ্তে ১০০০ নূরের মহল তৈরী হয়। এই দিনে রয়েছে আরো ৪ রাকআত খেয়ালী নামায।

অথবা যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী ১০ বার, সূরা ইখলাস ১১ বার এবং নাস ও ফালাক্ব ৫ বার। নামায শেষে ইস্তিগফার ৭০ বার। এ নামাযও বিদআত। *(মু'জামুল বিদা' ৩৪০-৩৪১পৃঃ)*

এই মাসের ১ থেকে ১০ তারীখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন যোহরের পর ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার। এ নামায হযরত হাসান-হোসেনের রূহের উপর বখশে দিলে কিয়ামতে তাঁদের নাকি সুপারিশ (!) লাভ হবে।

সফর মাস

সফর মাসের প্রথম দিনটি নাকি বান্দার গোনাহ মাফের দিন হিসেবে চিহ্নিত। এই তারীখের রাতে এশার পর ৪ রাকআত; প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন

১৫ বার। দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার। তৃতীয় রাকআতে সূরা ফালাক্ব ১৫ বার এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা নাস ১৫ বার। এতে সমস্ত বালা থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং খুব বেশী সওয়াব লাভ হয়।

এ মাসের ১ম সপ্তাহের জুমআর রাতে এশার পরে ৪ রাকআত নফল এবং তার খেয়ালী সওয়াবের কথার উল্লেখ রয়েছে অনেক কিতাবে। এ নামায শেষে মুনাজাতে নাকি বান্দার মনোবাসনা পূর্ণ হয়।

এই মাসের শেষ বুধবার বা আখেরী চাহার শোম্বার চাশ্তের সময় ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১১ বার করে পাঠ করে নামায পড়তে হয়।

এ সবের দলীল কি তা আপনার হুযুরকে জিজ্ঞাসা করুন।

রবিউল আওয়াল

এই মাসের প্রথম হতে ১২ তারীখ পর্যন্ত নাকি প্রত্যেক দিন ২০ রাকআত নামায পড়তে হয়; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস পড়তে হয় ২১ বার করে। এই নামায নবী ﷺ-এর নামে বখশে দিলে তিনি নামাযীকে নাকি বেহেশ্তের সুসংবাদ দেবেন!

অনেকের মতে এ মাসে নিয়মিত ১০৭০বার দরূদ পড়লে নাকি অভাবনীয় ধন-সম্পদের মালিক হওয়া যায়।

এ মাসের প্রত্যেক এশার পর ১২৫ বার করে দরূদ পড়লে স্বপ্নযোগে নাকি নবীয়ে দোজাহানের দীদার লাভ হয়, অশেষ পুণ্যের অধিকারী হওয়া যায়, রুযী-রোযগারে বর্কত হয় এ সুখময় জীবন-যাপনের অধিকারী হওয়া যায়।

আপনি আপনার হুজুরে মুহতারামকে এ সব কথার দলীল ও তার মান জিজ্ঞাসা করুন। আর জিজ্ঞাসা করুন, এ মাসের ১২ তারীখে 'নবীদিবস' পালন করার যৌক্তিকতা কি?

রবিউস্-সানী

আপনি মেহেরবানী করে আমল করার আগে আপনার হুজুরকে জিজ্ঞাসা করুন ঐ সকল বর্ণনা কোন্ হাদীসে আছে এবং তার মান কি?

জুমাদাস সানী

এই মাসের প্রথম তারীখের রাতে নাকি ৪ রাকআত নামায পড়তে হয়; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৩ বার করে পাঠ করতে হয়। এতে নাকি ১ লাখ নেকী লাভ হয় এবং ১ লাখ গোনাহ মোচন হয়!

এ রাতে ১২ রাকআত নামাযের কথাও বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

অনেকের খেয়াল মতে, এ মাসের চাঁদ দেখার পরহতে মাগরেবের নামাযের পর হযরত আবূ বাকর ﷺ ও অন্যান্য বিশিষ্ট সাহাবীগণ ১২ রাকআত নফল নামায আদায় করতেন এবং প্রতি রাকআতে ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১১ বার করে পাঠ করতেন। নামায শেষে আল্লাহর দরবারে দুআ ও মাগফিরাত কামনা করতেন।

আপনিও আমল করার পূর্বে আপনার হুজুরকে দয়া করে জিজ্ঞাসা করে নিন, এ সব বর্ণনা কোথায় আছে এবং তার মান কি?

রজব

এই মাসে ১, ১৫, ও শেষ তারীখে গোসল করলে নাকি (গঙ্গাজলে স্নান করার মত) প্রথম দিনকার শিশুর মত নিষ্পাপ হওয়া যায়!

এই মাসে ৩০ রাকআত নামায এবং তার ৫টি রাত ইবাদত করার খেয়ালী ফযীলত বর্ণনা করা হয়ে থাকে। বর্ণনা করা হয়ে থাকে আরো কত ফাযায়েল।

কারো মতে এ মাসের ১৫ তারীখে এশার পরে ৭০ রাকআত নামায পড়লে পৃথিবীর বৃক্ষরাজি পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়। *(মু'জামুল বিদ' ৩৪১পৃঃ দ্রঃ)*

আমল করার আগে আপনার দায়িত্ব হল, এ সবের সঠিক দলীল জেনে নেওয়া। নচেৎ ইবাদত করতে গিয়ে বিদআত করে বসলে ফল হবে উল্টা।

বাস্তব এই যে রজব মাসের ফযীলত সম্বন্ধে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি।

এই মাসের ১, ১৫ ও ২৯ তারীখে নাকি ৪ রাকআত নামায পড়তে হয়; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫ বার করে পাঠ করতে হয়। এতে ১০০০ সওয়াব লাভ, ১০০০ পাপ মাফ এবং ৪টি হূর লাভ হয়।

অনেকের খেয়াল মতে এ মাসের ১৫ তারীখে মাগরেবের পর ৪ রাকআত নামায পড়লে উভয়কালে কামিয়াবী লাভ হয়। এ মাসের শেষ রাতে ৪ রাকআত নামায পড়লে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

এ মাসের যে কোন বৃহস্পতিবার এশার নামাযান্তে নির্জনে বসে সূরা মুল্ক ১০০ বার পাঠ করে ২ রাকআত নফল নামায আদায় করলে এবং প্রত্যেক রাকআতে ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১১ বার করে পাঠ করলে নাকি কিয়ামতে সীমাহীন মর্যাদার অধিকারী হওয়া যায়। তদনুরূপ এই মাসের শেষ রাতেও ৪ রাকআত নামায যথানিয়মে আদায় করলে কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভ হয় এবং সেখানে শান্তি পাওয়া যায়।

আপনার খেয়ালী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করেন, এ সবের দলীল এবং তার মান কি?

জুমাদাল আওয়াল

এই মাসের প্রথম তারীখের রাতে ৪ রাকআত নামায; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১১ বার করে পড়ে আদায় করলে নাকি তাতে ৯০,০০০ বছরের নেকী লাভ হয় এবং ৯০,০০০ বছরের গোনাহ মোচন হয়ে যায়!

কারো খেয়াল মতে এ মাসের প্রথম তারীখে ২০ রাকআত নামায পড়তে হয়।

অনেকে বলেন, বর্ণিত আছে যে, এ মাসের প্রথম তারীখে নবী মুহাম্মাদ ﷺ নাকি সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে দুই দুই রাকআত করে মোট ২০ রাকআত নামায আদায় করতেন এবং নামায শেষে দরূদে ইব্রাহীম ১০০ বার পাঠ করে আল্লাহর দরবারে ইহকাল ও পরকালের শান্তির ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতেন।

এ মাসের ইবাদতে; নামায, রোযা বা উমরাহ পালনে কোন পৃথক মর্যাদা শরীয়তে নেই। সুতরাং নির্দিষ্ট নামায বা রোযার ব্যাপারে যে সব ফযীলত পাওয়া যায়, তা সব মনগড়া।

স্বালাতুর রাগায়েব

এই মাসে জুমআর রাতে এশার পরে ১২ রাকআত নামায পড়া হয়ে থাকে। ৬ সালামে প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ক্বাদ্‌র ৩ বার এবং সূরা ইখলাস ১২ বার পড়তে হয়। নামায শেষে ৭০ বার দরূদ শরীফ এবং আরো অন্যান্য দুআ ও সিজদাহ। এ সবই বিদআত। *(বিশেষ দ্রঃ তাবয়ীনুল আজাব, বিমা অরাদা ফী ফায়লি রাজাব, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২/২, মু'জামুল বিদা' ৩৩৮-৩৩৯, ৩৪২পৃঃ)*

শা'বান

এই মাসের ১ তারীখের রাতে নাকি ৪ রাকআত নামায; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার করে পড়তে হয়। এতে নাকি বেশুমার সওয়াব লাভ হয়।

এই মাসে যে কোন রাতে ১ সালামে ৮ রাকআত নামায পড়ে হযরত ফাতেমার নামে বখ্‌শে দিলে তিনি নাকি ঐ নামাযীর জন্য শাফাআত না করে বেহেশ্তে এক পা-ও দিবেন না!

আপনি ঐ শাফাআতের আশাধারী হওয়ার আগে দেখেন, যা চকচক করছে, তা আসলেই সোনা কি না?

রমযান

রমযান ও তার ইবাদত এবং বিদআত সম্পর্কে 'রমযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল' দ্রষ্টব্য।

শওয়াল

এই মাসের ১ তারীখের রাতে অথবা ঈদের নামাযের পর নাকি ৪ রাকআত নামায পড়তে হয়; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২১ বার করে পাঠ করতে হয়। এতে নাকি বেহেশ্তের ৮টি দরজা খোলা এবং দোযখের ৭টি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। মরার পূর্বে বেহেশ্তে নিজের স্থান দেখা যায়।

এ ছাড়া দিনে অথবা রাতে আরো ৮ রাকআত নামাযের কথা বলা হয়। যার দলীল তলব করুন আপনার হযরত জীর কাছে।

রমযানের রোযা রাখার পর এ মাসে ছয়টি রোযা রাখলে সারা বছর রোযা রাখার সমান সওয়াব লাভ হয় -এ কথা সহীহ হাদীসে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এ মাসে ৬টি রোযা রাখলে তার আমল-নামায় প্রতিটি রোযার বিনিময়ে এক হাজার নফল রোযার ফযীলত লেখা হয়, এ মাসে মৃত্যুবরণ করলে শহীদের দর্জা লাভ হয়, তার আমল-নামায় সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর নফল রোযাসমূহের সওয়াব লিখা হয় এবং সে ব্যক্তি প্রথম খলীফা হযরত আবূ বাকরের সাথে বেহেশ্তে এক সাথে অবস্থান করবে -ইত্যাদি কথা কোন্ হাদীসে আছে এবং তার মান কি? এ সব বিশ্বাস করার আগে অবশ্যই আপনার হুজুর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন।

যুল-ক্বা'দাহ

এই মাসের ১ তারীখের রাতে নাকি ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২৩ বার করে পাঠ করতে হয়। এতে নাকি বেহেশ্তে ৪০০০ লাল ইয়াকূতের ঘর তৈরী হয়! প্রত্যেক ঘরে জওহারের সিংহাসন থাকবে!! প্রত্যেক

সিংহাসনে হুর বসা থাকবে; তাদের কপাল সূর্য অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল হবে!!!

এ ছাড়া এই মাসের প্রত্যেক রাতে ২ রাকআত নামায পড়লে নাকি ১ জন শহীদ ও ১ হজ্জের সওয়াব লাভ হবে! আর এই মাসের প্রত্যেক শুক্রবার ৪ রাকআত নামায পড়লে ১টি হজ্জ ও ১টি উমরার সওয়াব হবে!!

এ মাসের প্রথম সোমবার রোযা রাখলে আমলনামায় নাকি এক হাজার বছরের অধিক নফল রোযা রাখার সওয়াব লিখা হয়। আর এ মাসের যে কোনও একটি দিন রোযা রাখলে সে দিনটির প্রতিটি ঘন্টার পরিবর্তে এক একটি কবুল হজ্জের সওয়াব আমলনামায় লিখা হয়!

একটু কষ্ট করে বেআদবী হলেও আপনার হুজুরকে জিজ্ঞাসা করে নিন এ সবের পাকা দলীল কোথায়?

যুল-হাজ্জাহ

এই মাসের ১ তারীখের রাতে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২৫ বার। এতে বেশুমার সওয়াব লাভ হয়।

এ মাসের প্রথম ১০ দিনের বিতরের নামাযের পর ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা কাওসার ৩ বার এবং সূরা ইখলাস ৩ বার পড়লে 'মাকামে ইল্লীন' (?) লাভ হবে, প্রত্যেক কেশের বদলে ১০০০ নেকী এবং ১০০০ দীনার সদকা করার সওয়াব লাভ হবে!

আবারো বলি, কেবল মেহেরবানী করে এ সবের পাকা দলীল তলব করুন। জিজ্ঞাসা করুন, সে পবিত্র হাদীস কোথায় আছে এবং তার মান কি? যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَسۡـَٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٤٣ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِۗ ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা না জান, তাহলে বিজ্ঞগণকে জিজ্ঞাসা করে নাও দলীল-প্রমাণ ও গ্রন্থসহ। *(সূরা নাহল ৪৩-৪৪ আয়াত)*

আশূরা ও মুহার্রাম

চান্দ্র বছরের বারো মাস আল্লাহর নির্ধারিত সে কথা সবাই জানে। তার মধ্যে চারটি মাস 'আশহুরুল হুরুম' (অর্থাৎ নিষিদ্ধ মাস) নামে পরিচিত। যেহেতু বিশেষ করে সেই মাসগুলিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-দাঙ্গা করা হারাম বা নিষিদ্ধ তাই। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُۚ فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡۚ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট পৃথিবী ও আকাশমন্ডলী সৃষ্টি করার দিন হতেই আল্লাহর কিতাবে মাসসমূহের সংখ্যা হল বারো। এর মধ্যে চারটি মাস হল নিষিদ্ধ। এটাই হল সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। সুতরাং তোমরা এ মাসগুলিতে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। *(সূরা তাওবাহ ৩৬ আয়াত)*

আর ঐ চারটি মাস হল ঃ যুল-ক্বা'দাহ, যুল-হাজ্জাহ, মুহার্রাম ও রজব। এই হল মহান আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত চারটি মাসের মর্যাদা।

শরীয়তে মুহার্রাম মাসের যে মর্যাদা রয়েছে, তা রক্ষা করার সাথে সাথে আমাদের অতিরিক্ত কর্তব্য হিসাবে রোযা পালন করার বিধান রয়েছে।

বলা বাহুল্য সুন্নত রোযাসমূহের মধ্যে মুহার্রাম মাসের রোযা অন্যতম। রমযানের পর পর রয়েছে এই রোযার মান। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "রমযানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা হল আল্লাহর মাস মুহার্রামের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হল রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।" *(মুসলিম ১১৬৩নং, সুনান আরবাআহ, ইবনে খুযাইমাহ)*

মুহার্রাম মাসের রোযার মধ্যে সবচেয়ে বেশী তাকীদপ্রাপ্ত হল ঐ মাসের ১০

তারীখ আশূরার দিনের রোযা। রমযানের রোযা ফরয হওয়ার আগে এই রোযা ওয়াজেব ছিল। রুবাইয়ে' বিন্তে মুআউবিয বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আশূরার সকালে মদীনার আশেপাশে আনসারদের বস্তিতে বস্তিতে খবর পাঠিয়ে দিলেন যে, "যে রোযা অবস্থায় সকাল করেছে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি রোযা না রাখা অবস্থায় সকাল করেছে সেও যেন তার বাকী দিন পূর্ণ করে নেয়।"

রুবাইয়ে' বলেন, 'আমরা তার পর হতে ঐ রোযা রাখতাম এবং আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও রাখাতাম। তাদের জন্য তুলোর খেলনা তৈরী করতাম এবং তাদেরকে মসজিদে নিয়ে যেতাম। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ খাবারের জন্য কাঁদতে শুরু করলে তাকে ঐ খেলনা দিতাম। আর এইভাবে ইফতারের সময় এসে পৌঁছত।' *(আহমাদ ৬/৩৫৯, বুখারী ১৯৬০, মুসলিম ১১৩৬, ইবনে খুযাইমা ২০৮৮নং, বাইহাক্বী ৪/২৮৮)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'কুরাইশরা জাহেলিয়াতের যুগে আশূরার রোযা পালন করত। আর আল্লাহর রসূল ﷺ-ও জাহেলিয়াতে ঐ রোযা রাখতেন। (ঐ দিন ছিল কাবায় গিলাফ চড়াবার দিন।) অতঃপর তিনি যখন মদীনায় এলেন, তখনও তিনি ঐ রোযা রাখলেন এবং সকলকে রাখতে আদেশ দিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন রমযানের রোযা ফরয হল, তখন আশূরার রোযা ছেড়ে দিলেন। তখন অবস্থা এই হল যে, যার ইচ্ছা হবে সে রাখবে এবং যার ইচ্ছা হবে সে রাখবে না।' *(বুখারী ১৯৫২, ২০০২, মুসলিম ১১২৫নং প্রমুখ)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, মহানবী ﷺ যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন দেখলেন, ইয়াহুদীরা আশূরার দিনে রোযা পালন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি এমন দিন যে, তোমরা এ দিনে রোযা রাখছ?" ইয়াহুদীরা বলল, 'এ এক উত্তম দিন। এ দিনে আল্লাহ বানী ইসরাঈলকে তাদের শত্রু থেকে পরিত্রাণ দিয়েছিলেন। তাই মূসা এরই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই দিনে রোযা পালন করেছিলেন। (আর সেই জন্যই আমরাও এ দিনে রোযা রেখে থাকি।)'

এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "মূসার স্মৃতি পালন করার ব্যাপারে তোমাদের চাইতে আমি অধিক হকদার।" সুতরাং তিনি ঐ দিনে রোযা রাখলেন এবং সকলকে রোযা রাখতে আদেশ দিলেন। *(বুখারী ২০০৪, মুসলিম ১১৩০নং)*

বলাই বাহুল্য যে, উক্ত আদেশ ছিল মুস্তাহাব। যেমন মা আয়েশার উক্তিতে তা স্পষ্ট। তা ছাড়া মহানবী ﷺ বলেন, "আজকে আশূরার দিন; এর রোযা আল্লাহ তোমাদের উপর ফরয করেন নি। তবে আমি রোযা রেখেছি। সুতরাং যার ইচ্ছা সে রোযা রাখবে, যার ইচ্ছা সে রাখবে না।" *(বুখারী ২০০৩, মুসলিম ১১২৯নং)*

আবু কাতাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লার রসূল ﷺ আশূরার দিন রোযা রাখা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "আমি আশা করি যে, (উক্ত রোযা) বিগত এক বছরের পাপরাশি মোচন করে দেবে।" *(আহমাদ ৫/২৯৭, মুসলিম ১১৬২, আবূ দাউদ ২৪২৫, বাইহাক্বী ৪/২৮৬)*

ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রমযানের রোযার পর আশূরার দিন ছাড়া কোন দিনকে অন্য দিন অপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ মনে করতেন না।' *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ১০০৬ নং)* অনুরূপ বর্ণিত আছে বুখারী ও মুসলিম শরীফে। *(বুখারী ২০০৬, মুসলিম ১১৩২নং)*

অবশ্য যে ব্যক্তি আশূরার রোযা রাখবে তার জন্য তার একদিন আগে (৯ তারীখে)ও একটি রোযা রাখা সুন্নত। যেহেতু ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন আশূরার রোযা রাখলেন এবং সকলকে রাখার আদেশ দিলেন, তখন লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ দিনটিকে তো ইয়াহুদ ও নাসারারা তা'যীম করে থাকে।' তিনি বললেন, "তাহলে আমরা আগামী বছরে ৯ তারীখেও রোযা রাখব ইনশাআল্লাহ।" কিন্তু আগামী বছর আসার আগেই আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল হয়ে গেল। *(মুসলিম ১১৩৪, আবূ দাউদ ২৪৪৫নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'তোমরা ৯ ও ১০ তারীখে রোযা রাখ।' *(বাইহাক্বী ৪/২৮৭, আব্দুর রায্যাক ৭৮৩৯নং)*

পক্ষান্তরে "তোমরা এর একদিন আগে বা একদিন পরে একটি রোযা রাখ" - এই হাদীস সহীহ নয়। *(ইবনে খুযাইমা ২০৯৫নং, আলবানীর টীকা দ্রঃ)* তদনুরূপ

সহীহ নয় “তোমরা এর একদিন আগে একটি এবং একদিন পরেও একটি রোযা রাখ” -এই হাদীস। *(যাদুল মাআদ ২/৭৬ টীকা দ্রঃ)*

বলা বাহুল্য, ৯ ও ১০ তারীখেই রোযা রাখা সুন্নত। পক্ষান্তরে কেবল ১০ তারীখে রোযা রাখা মকরূহ। *(ইবনে বায, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ২/১৭০)* যেহেতু তাতে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য সাধন হয় এবং তা মহানবী ﷺ-এর আশার প্রতিকূল। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, 'মকরূহ নয়। তবে কেউ একদিন (কেবল আশূরার দিন) রোযা রাখলে পূর্ণ সওয়াবের অধিকারী হবে না।'
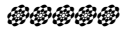
জ্ঞাতব্য যে, হুসাইন ﷺ-এর এই দিনে শহীদ হওয়ার সাথে এ রোযার কোন নিকট অথবা দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, তার পূর্বে মহানবী ﷺ; বরং তাঁর পূর্বে মূসা নবী ﷺ এই দিনে রোযা রেখে গেছেন। আর এই দিনে শিয়া সম্প্রদায় যে মাতম ও শোক পালন, মুখ ও বুক চিরে, গালে থাপর মেরে, চুল-জামা ছিঁড়ে, পিঠে চাবুক মেরে আত্মপ্রহার ইত্যাদি করে থাকে, তা জঘন্যতম বিদআত। সুন্নাহতে এ সবের কোন ভিত্তি নেই।

পরন্তু মৃতব্যক্তির জন্য মাতম করা বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মানুষের মাঝে দুটি কর্ম এমন রয়েছে যা কুফরী (কাফেরদের কাজ)। (প্রথমটি হল,) বংশে খোঁটা দেওয়া এবং (দ্বিতীয়টি হল,) মৃতের জন্য মাতম করা।” *(মুসলিম ৬৭নং)*

হযরত আবূ মালেক আশআরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “আমার উম্মতের মাঝে চারটি কাজ হল জাহেলিয়াতের প্রথা, যা তারা ত্যাগ করবে না; বংশ নিয়ে গর্ব করা, (কারো) বংশ-সূত্রে খোঁটা দেওয়া, তারা (ও নক্ষত্রের) মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং (মুর্দার জন্য) মাতম করা।”

আসলে বিলাপ ও মাতম করে কান্না করা মহিলাদের অভ্যাস। তাই রসূল ﷺ মহিলাদের জন্য বলেছেন, “আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসিনী কোন কোন মহিলার জন্য কোন মৃতের উপর তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়। তবে মৃত স্বামী হলে তার উপর ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে।”

(বুখারী ১২০১ক, মুসলিম ২৭৩০ক, প্রমুখ)

তিনি আরো বলেন, “মাতমকারিণী মহিলা যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে মারা যায়, তাহলে কিয়ামতের দিনে তাকে গলিত (উত্তপ্ত) তামার পায়জামা (শেলোয়ার) ও চুলকানিদার (অথবা দোযখের আগুনের তৈরী) কামীস পরা অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে।” *(মুসলিম ৯৩৪, ইবনে মাজাহ ১৫৮১নং)*

হযরত ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (বিপদে অধৈর্য হয়ে অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) গালে চাপড় মারে গলা ও বুকের কাপড় ফাড়ে এবং জাহেলী যুগের (লোকেদের) মত ডাক ছেড়ে মাতম করে!” *(বুখারী ১২৯৪, ২১৯৭, মুসলিম ১০৩, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ১৫৮৪নং, আহমাদ, ইবনে হিব্বান)*

হযরত আবূ বুরদাহ ﷺ বলেন, (আমার পিতা) আবূ মূসা আশআরী একদা অসুখের যন্ত্রণায় মূর্ছা গেলেন। সে সময় তাঁর এক পরিবারের কোলে তাঁর মাথা রাখা ছিল। সে তখন সুর ধরে চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিল। সে অবস্থায় আবু মূসা তাকে বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন বললেন, 'সেই লোকের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, যে লোক হতে আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ সে মহিলা হতে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছেন, যে (বিপদে অধৈর্য হয়ে অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) উচ্চরবে বিলাপ করে, মাতম করে, মাথার কেশ মুন্ডন করে এবং নিজের পরিহিত কাপড় ছেঁড়ে। *(বুখারী কাটা সনদে ১২৯৬নং, মুসলিম ১০৪, ইবনে মাজাহ ১৫৮৬নং, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান)*

মাতম করা বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে শোকপালন শরীয়তে বৈধ নয়; না হযরত হুসাইনের জন্য, আর না-ই তাঁর থেকে বড় কোন সাহাবী অথবা কোন নবীর জন্য। কেবল শহীদদের জন্য হলেও আপনি কাকে ছেড়ে কার কত শোক পালন করবেন? প্রায় দিনই তো কেউ না কেউ শহীদ হয়েছেন।

আশূরার দিন 'মহর্রম' পরব মানাতে গিয়ে কিছু মুসলমান তাযিয়া বানিয়ে থাকে। হযরত হুসাইনের নকল কবর বানিয়ে তা রথের মত রাস্তায় রাস্তায়

বলাই বাহুল্য যে, উক্ত আমোদ করতে গিয়ে মুসলিমদের কত শত অর্থের অপচর ঘটে। যে অর্থ সম্পর্কে কাল কিয়ামতে তাকে প্রশ্ন করা হবে।

পক্ষান্তরে এক সম্প্রদায়কে দেখা যায় যে, ফূর্তি ও ফুটানি করার জন্য তাদের পকেটে পয়সা নেই দেখে অমুসলিমদের পূজোর চাঁদা তোলার অনুকরণে তারাও জোরপূর্বক পথে-বাজারে চাঁদা তুলে বেড়ায়। যাতে তারা উভয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঘৃণিত হয়। দেশের আইনের কাছেও তারা হয় অপরাধী।

অমুসলিমরা হয়তো ধারণা করে যে, এটাও হল ইসলাম। অথচ মুসলিমের ঘরে জন্ম নিয়ে তারা যে, কুলের কুলাঙ্গার তা তাদেরকে কে বুঝাবে? কে বুঝাবে যে, তাদের ঐ ইসলামে যদি ঐ শ্রেণীর আমোদ-ফূর্তি না থাকতো, তাহলে ভুলেও তারা সে কাজ করতো না। যেহেতু তারাই তো কোন মাদ্রাসার জন্য মুসলিমদের কাছে চাঁদা করতে দেখলে নাক সিঁটকায় এবং তারই জন্য মাদ্রাসার শিক্ষাকে 'ভিখেরী বিদ্যা' বলে অভিহিত করে।

আসলে বিজাতির দেখাদেখি আনন্দ লাভের মানসে ধর্মকে আনুষ্ঠানিকতার হৈচৈ-এ সীমাবদ্ধ করে ঐ শ্রেণীর লোকেরা এই ধরনের পরব পালন করে থাকে। আসলে হযরত হুসাইন বা তাঁর নানার সাথে যতটা মহব্বত তারা প্রকাশ করে থাকে, তার থেকে আরো বেশী প্রকাশ করে থাকে আমোদ-ফূর্তির সাথে তাদের প্রধান মহব্বত। সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে সৎপথ দেখান। আমীন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিদআতের এই ঘটা নবী বা সাহাবাদের যুগে ছিল না। ছিল না তাবেয়ীদের যুগে। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য এই বিদআত সর্বপ্রথম চালু করে রাজা মুইয্যুদ দাওলাহ (মুয়ীজুদ্দুল্লা) ফাতেমী বাগদাদে ৩৫২ হিজরীতে। আর ধীরে ধীরে তা উপমহাদেশে চালু হয় প্রায় ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দের পরে বাদশাহ তৈমুরলঙ্গের যুগে।

হুসাইন ﷺ মুহার্রাম ও আশূরাকে কেন্দ্র করে কত শত বানাওয়াটি ও মনগড়া হাদীস ও ইতিহাস তৈরী হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে একাধিক উপন্যাস ও কাব্য। আর সেই সব মনগড়া হাদীস ও উপন্যাসকে ভিত্তি করে আমাদের যুবকরা আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করতে আনন্দবোধ করছে।

ঘুরানো হয় এবং নিয়ে যাওয়া হয় নকল কারবালার ময়দানে। আর সেই সঙ্গে ঢাক-ঢোল, বাজনা-বাঁশি, শির্কী ও বিদআতী মর্সিয়া সহ মাতম করা হয়, তলোয়ার ও লাঠি খেলা হয়, আত্মপ্রহার করা হয়, মদ খেয়ে নাচা হয় ও আমোদ-ফূর্তি করা হয়।

দলে দলে যিয়ারত করা হয় সেই নকল কবরের, সিজদা করা হয়, সেখানে নযর মানা ও পূরণ করা হয়। আর এ সব যে ইসলামী শরীয়তে হারাম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ ছাড়া কোন কোন সম্প্রদায় নিশানার বের করে মর্সিয়া (শোকগাথা) গেয়ে বেড়ায়। যে মর্সিয়াতে সাহাবী মুআবিয়া ﷺ ও তাঁর ছেলে ইয়াযীদকে গালাগালি করা হয়, [2] কাফের বলা হয়, ইত্যাদি।

অথচ আমাদের শরীয়ত আমাদেরকে বলে, "তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। যেহেতু তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে।" (বুখারী)

"তোমরা মৃতদেরকে গালি দিয়ে জীবিতদেরকে কষ্ট দিও না।" (সহীহ তিরমিযী ২/১৯০)

কাউকে কাফের বলাও সহজ ব্যাপার নয়। যেহেতু তাতে নিজের ক্ষতি নিজে করা হয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন,

"যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইকে 'কাফের' বলে তাদের উভয়ের একজনের উপর তা বর্তায়।" (বুখারী ও মুসলিম) "যদি সে কাফের হয় যেমন সে বলে; নচেৎ তা তারই উপর ফিরে আসে।" (মুসলিম)

"কোন ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তিকে কাফের বা ফাসেক বলে অভিহিত করে, তখন তা তারই উপর ফিরে আসে যদি অপর ব্যক্তি তা না হয়।" (বুখারী)

খানা-পানি দান করা ভালো জিনিস হলেও ঐ দিনে দান করা ভালো বলে কোন দলীল নেই আর সেই জন্য ঐ দিনে নির্দিষ্ট করে তা দান করা বিদআত।

([2]) ইয়াযীদ বা এযীদ সম্পর্কে জানতে 'তাওহীদ' পড়ুন।

আশূরার বানাওটি ফযীলত ঃ

আশূরার কতিপয় মনগড়া ফযীলতের জাল অথবা দুর্বল হাদীস লোকমুখে অথবা বাজারী কিতাবে প্রচলিত আছে। যে সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

১। যে ব্যক্তি আশূরার দিন ইষমিদ সুর্মা ব্যবহার করবে, তার কখনো চোখের রোগ হবে না। *(যয়ীফুল জামে' ৫৪৬৭নং)*

২। যে ব্যক্তি আশূরার দিনে নিজ পরিবার-পরিজনের উপর খরচ বৃদ্ধি করবে, আল্লাহ তার সেই বছরের সকল দিনে প্রশস্ততা দান করবেন। *(ঐ ৫৮৭৩নং)*

৩। যে ব্যক্তি আশূরার দিন রোযা রাখবে, তার আমল নামায় ৬০ বছরের রোযা ও নামাযের সওয়াব লিখা হবে।

৪। যে ব্যক্তি আশূরার দিন রোযা রাখবে, সে ১০ হাজার শহীদের সওয়াব লাভ করবে।

৫। যে ব্যক্তি আশূরার দিন গোসল করবে, তার সেই বছরে কোন অসুখ হবে না।

৬। যে ব্যক্তি আশূরার রাত্রি জেগে ইবাদত করবে, ---- তার ৫০ বছর পূর্বের এবং ৫০ বছর পরের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

৭। আশূরার দিন আল্লাহ আরশে আসীন হয়েছেন।

৮। আশূরার দিন কিয়ামত কায়েম হবে। ইত্যাদি

আখেরী চাহার শোম্বা

ফারসী ভাষায় 'আখেরী চাহার শোম্বা' মানে হল, শেষ বুধবার। সফর মাসে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ নাকি কিছুদিন অসুস্থ থেকে এই মাসের শেষ বুধবার তিনি রোগমুক্ত হয়ে স্নানাহার করেছিলেন। সেই জন্য এ দিনে বহু মুসলমান আনন্দোৎসব করে থাকে, বিরাট জাঁকজমকের সাথে সিন্নি-সালাত, মীলাদ-মাহফিল, খেলাধূলা ও বনভোজন ইত্যাদি করে থাকে। মনে করা হয় যে, এই দিনটিতে দান-খয়রাত করা, গরীব-মিসকীনদিগকে খাওয়ানো ও দুআ-দরূদ পাঠ করা ইত্যাদি বহু নেকীর কাজ।

প্রকাশ থাকে যে, 'বিষাদ-সিন্ধু' কোন ইতিহাসের বই নয়; বরং তা একটি উপন্যাস। সুতরাং সেই বই থেকে ইতিহাস গ্রহণ করে তা বিশ্বাস করা আমাদের উচিত নয়।

আমাদের উচিত, নবী ﷺ ও তাঁর পরিবারের সকলের প্রতি প্রগাঢ় মহব্বত রাখা। তা না রাখলে আমাদের ঈমান থাকতে পারে না।

পক্ষান্তরে এই দিনে নিজ পরিবার-পরিজনের উপর খরচ বৃদ্ধি করা, ভালো খাবার খাওয়া, বিশেষ কোন নামায পড়া, দান-খয়রাত করা, বিশেষ করে শরবত-পানি দান করা, কলফ ব্যবহার করা, তেল মাখা, সুরমা ব্যবহার করা প্রভৃতি বিদআত। এ সকল বিদআত হযরত হুসাইন ﷺ-এর খুনীরাই আবিষ্কার করে গেছে। *(তামামুল মিন্নাহ ৪১২পৃঃ দ্রঃ)*

১০ই মুহার্রমের শহীদদেরকে স্মরণ করে আনন্দ করে বা কেঁদে আর লাভ কি? আমরা জয়নাল আবেদীনের মত কেঁদে উম্মতের কি করতে পারি? আজ সারা বিশ্বে অধিকাংশ মুসলিমদেরই দেশ লহুতে লাল হচ্ছে।

"মুসলিম! তোরা আজ জয়নাল আবেদীন,
'ওয়া হোসেনা - ওয়া হোসেনা' কেঁদে তাই যাবে দিন!"

না, তা নয়। বরং আমাদের সেই কারবালার শিক্ষা নিয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করে সত্যের পথে সংগ্রাম করতে হবে।

"ফিরে এল আবার সেই মুহর্রম মাহিনা,
ত্যাগ চাহি মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।
উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির।
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা।
বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তুর্য্য,
হুঁশিয়ার ইসলাম, ডুবে তবে সূর্য্য।"

বলাই বাহুল্য যে, কাজ ভালো হলেও সে কাজকে কোন নির্দিষ্ট দিনের মাঝে সীমাবদ্ধ করা যায় না। নচেৎ অনির্দিষ্ট কাজকে কাল, পাত্র, পরিমাণ বা পদ্ধতি দ্বারা নির্দিষ্ট করলে বিদআত হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীন বিষয়ে অভিনব কিছু রচনা করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ১৭১৮নং)*

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন কর্ম করে; যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম ১৭১৮ নং)*

এ ছাড়া মনে করা হয় যে, ঐ দিনে প্রাণপ্রিয় নবীজীর রোগ নিরাময় হয়েছে। তিনি রোগের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছেন এবং ঐ দিন নাকি তিনি শহরের বাইরে বেড়াতে গেছেন। তাই দেখা যায়, আমোদের মুসলিমরা ঐ দিনে হালোয়া-রুটি খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে এবং শহরের বাইরে বেড়াতে যায়।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁর জীবনের সফর মাসের শেষ বুধবার রোগ নিরাময় নয়; বরং সফর মাসের ২৯ তারীখে তিনি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অতএব আপনি আপনার হালোয়া-রুটির হুজুরকে জিজ্ঞাসা করে নিন যে, ঐ সকল নামাযের এবং আখেরী চাহার শোম্বা পালনের সঠিক ইতিহাস ও দলীল কি? তা ছাড়া সে রোগ নিরাময়ের কথা সঠিক হলেও কি উম্মতের জন্য তা পালনীয় দিন হিসাবে গণ্য হতে পারে? নাকি 'হালোয়া-রুটি খানে কে লিয়ে কুছ বাহানা চাহিয়ে?'

নবীদিবস (মীলাদ)

'মীলাদ' বা 'মাওলিদ' মানে জন্মদিন বা জন্মক্ষণ। মহানবী ﷺ-এর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে অথবা নতুন বাড়ি, দোকান, কারখানা বা গাড়ি উদ্বোধনের সময় অথবা কোন মর্যাদাপূর্ণ দিন বা রাতে ভালো মনে করে সওয়াবের আশায় 'মীলাদ' বা 'মৌলুদ' পাঠ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মোরগের বাহনে আগত এই মীলাদ অনুষ্ঠান স্বার্থের খাতিরে বহু হুযুরেই পালন করে থাকেন। এক পাত গোশ্ত-ভাত বা ২/৫টা বাতাসা বা মিষ্টির

লোভে উপস্থিত হয় বহু নামাযী-বেনামাযী মানুষ। রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য দেশের অধিকাংশ মানুষের মন যোগাতে ঐ দিনকে সরকারী ছুটি বলে ঘোষণা করা হয়। কোন কোন দেশে তা পালনের জন্য অনেক প্রকার সাহায্য-সহযোগিতাও করা হয়। কিন্তু সে অনুষ্ঠানের ধর্মীয় স্বরূপ কি?

মহান আল্লাহ আমাদের দ্বীন ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন তাঁর নবীর জীবদ্দশাতেই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَـٰمَ دِينًا ﴾

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ (নেয়ামত) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। *(সূরা মায়েদাহ ৩ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু আবিষ্কার করে সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী ও মুসলিম)* "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই সে ব্যক্তির সে কাজ প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম)*

ইসলামে পালনীয় ঈদ হল মাত্র দুটি; ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহা। তৃতীয় কোন ঈদ ইসলামে নেই। মহানবী ﷺ নবুয়তের ২৩ বছর কাল নিজের জীবনে কোন বছর নিজের জন্মদিন পালন করে যাননি। কোন সাহাবীকে তা পালন করার নির্দেশও দেননি। তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের জন্ম-মৃত্যু উপলক্ষ্যে কোন আনন্দ অথবা শোকপালন করে যাননি।

তাঁর পরবর্তীকালে তাঁর চারজন খলীফা তাঁদের খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয়ভাবে অথবা একাকী নবীদিবস পালন করে যাননি। অন্য কোন সাহাবী বা আত্মীয়ও তাঁর প্রতি এত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আনন্দ অথবা মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে শোক পালন করেননি। তাঁদের পরেও কোন তাবেঈ অথবা তাঁদের কোন একনিষ্ঠ অনুসারী অথবা কোন ইমাম তাঁর জন্ম কিংবা মৃত্যুদিন পালন করার ইঙ্গিত দিয়ে যাননি। সুতরাং তা যে নব আবিষ্কৃত

মীলাদীরা মহানবী ﷺ-এর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে নানা আজগুবি কথা শুনিয়ে থাকে। অতিরঞ্জিত কাল্পনিক ইতিহাস বর্ণনা করে থাকে। যেমন কবি বলেছেন,

'পানি কওসর
মণি জওহর
আনি জিবরাঈল আজ হরদম দামে গওহর,
টানি মালিক-উল-মওত জিঞ্জির বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহর।
হানি বরষা সহসা মিকাঈল করে
উষর আরবে ভিঙা,
বাজে নব সৃষ্টির উল্লাসে ঘন ইসরাফীলের শিঙা!'

মীলাদ-উদ্যোক্তারা অধিকাংশ শির্কে আপতিত হয়ে থাকে। যেহেতু এতে তারা শির্কী না'ত ও গজল আবৃত্তি করে থাকে। যেমন,

'হে আল্লাহর রসূল! মদদ ও সাহায্য
হে আল্লাহর রসূল! আপনার উপরেই আমার ভরসা।
হে আল্লাহর রসূল! আমাদের সঙ্কট দূর করুন,
সঙ্কট তো আপনাকে দেখলেই সরে পড়ে!!'

এ কথা যদি রসূল ﷺ শুনতেন তাহলে নিশ্চয় তিনি তা শির্কে আকবর বলে অভিহিত করতেন। যেহেতু সাহায্য, মদদ ও সঙ্কটমুক্ত করা একমাত্র আল্লাহর কাজ এবং ভরসাস্থলও একমাত্র তিনিই। আল্লাহ তাআলা বলেন, "অথবা কে আর্তের আহ্বানে সাড়া দেয় যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করে? এবং কে তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করে ? আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্য আছে কি?" *(সূরা নাম্‌ল ৬২ আয়াত)*

আল্লাহ তাঁর রসূলকে আদেশ করেন যে, "বল, 'আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নই?' *(সূরা জিন ২১ আয়াত)*

আর নবী ﷺ বলেন,"যখন (কিছু) চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট চাও এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহরই নিকট কর।" *(তিরমিযী)*

বিদআত, তা বলাই বাহুল্য।

তাছাড়া অধিকাংশ 'ঈদে-মীলাদুন-নবী'র অনুষ্ঠানে যা ঘটে থাকে তা গর্হিত, বিদআত, এবং শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ; এর অন্যথা নয়। পক্ষান্তরে এই ঈদে মীলাদ রসূল ﷺ, তাঁর সাহাবাবৃন্দ, তাবেয়ীবর্গ, চার ইমামগণ এবং শ্রেষ্ঠতম (প্রারম্ভিক) শতাব্দীগুলির অন্য কেউই পালন করে যাননি। আর এর সপক্ষে কোন শরয়ী প্রমাণও নেই। যদি তা পালন করা বিধেয় বা ভালো হত, তাহলে আমাদের আগে তাঁরাই তা পালন করে যেতেন। আর যখন তাঁরা তা পালন করে যাননি, তখন বোঝা গেল যে, অবশ্যই আমাদের তা পালন করা বিদআত ও হারাম।

মীলাদে যা হয়

শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষে জন্মাষ্টমীতে হিন্দুরা যে অনুষ্ঠান করে থাকেন, সেখানে একজন ভাল বক্তা আসেন। ধূপদান, লোবান ও মোমবাতির মাঝে বক্তার ডাইনে থাকে তাঁদের পবিত্র গ্রন্থ 'গীতা' এবং পিছনে থাকে শিষ্যের দল। অতঃপর বক্তা বিভিন্ন ভঙ্গীতে মহামতি শ্রীকৃষ্ণের জীবনী বর্ণনা শুরু করেন এবং ফাঁকে ফাঁকে সুরেলা কণ্ঠে প্রশংসাসূচক কবিতা আওড়াতে থাকেন।

উপস্থিত শ্রোতা ও শিষ্যমন্ডলীর সকলে মাথা দুলিয়ে তালে তাল মিলিয়ে ঐ সুর ভাঁজতে থাকেন। এমন সময় হঠাৎ এক পর্যায়ে বক্তা দাঁড়িয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলে দাঁড়িয়ে ঢোল-করতাল বাজিয়ে সমস্বরে গাইতে থাকেন, 'স্বর্গে ছিল রামের নাম, মর্ত্যে কে আনিল রে---?' *(মিলাদ মাহফিল ৬৩পৃঃ, মীলাদ প্রসঙ্গ, মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ৮-৯পৃঃ)*

বলা বাহুল্য মীলাদী বিদআতীরাও অনুরূপ মহানবী ﷺ-এর জন্ম-বৃত্তান্ত মধুর কণ্ঠে বিবৃত করে; বলে, 'মারহাবা ইয়া মারহাবা রাহমাতাল লিল-আলামীন, ইয়হার ইয়া সাইয়িদাল মুরসালীন---।' অর্থাৎ, খোশ-আমদেদ, খোশ-আমদেদ হে জগদ্বাসীর রহমত! আবির্ভূত হন হে রসূলদের সর্দার!---'

অতঃপর তড়াক্ করে উঠে 'কিয়াম' করে 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' শুরু হয়ে যায়।

ওদের অনেকে বলে থাকে,

'ওহ জো মুস্তাবী আর্শ থা খোদা হো কর,
উতর পড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মুস্তাফা হো কর।'

অর্থাৎ, তিনি, যিনি খোদা হয়ে আরশে আসীন ছিলেন। তিনিই মুস্তাফা হয়ে মদীনায় অবতীর্ণ হলেন!

বলাই বাহুল্য যে, এরা হল তারা, যারা বলে থাকে,

'আকার না নিরাকার সেই রব্বানা,
আহমাদ 'আহাদ' হলে তবে যায় জানা!'
'আহমাদের ঐ মীমের পর্দা তুলে দেরে মন,
দেখবি সেথা বিরাজ করে 'আহাদ' নিরঞ্জন।'

আর তারাই বলে থাকে, তিনি হলেন বিনা আয়নের আরব (অর্থাৎ রব)। পরন্তু দ্বীনের জ্ঞান যাদের আছে, তাদের কাছে এ কথা অস্পষ্ট নয় যে, এমন আকীদা ও বিশ্বাস মানুষকে অবতারবাদী পৌত্তলিক তথা নবী ঈসা ﷺ-কে স্বয়ং আল্লাহ মাননে-ওয়ালাদের মত কাফের করে ফেলে।

অধিকাংশ মীলাদে রসূল ﷺ-এর প্রশংসায় সীমালংঘন, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থাকে; অথচ নবী ﷺ তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করো না, যেমন খ্রীষ্টানরা মারয়্যাম পুত্র (ঈসার) করেছে। যেহেতু আমি তো একজন দাস মাত্র, অতএব তোমরা আমাকে 'আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূল'ই বলো।" *(বুখারী)*

উরস, মীলাদ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয় যে, আল্লাহ তাঁর নূর (জ্যোতি) হতে মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর (মুহাম্মাদের) নূর হতে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। মীলাদীরা আল্লাহর নবী ﷺ-কে নূরের সৃষ্টি এবং তাঁর নূরে জগৎ সৃষ্টি বলে থাকে। তারা গেয়ে থাকে,

'আমার মুর্শিদেরি নূরের ধারায়,
কুল্ মাখলুকাত সৃষ্টি হল-
আরশ-কুর্সী, লাওহ ও কলম

তাঁরই নূরে সৃষ্টি হল।---'

পরন্তু কুরআন তাদের এই কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ বলেন, "বল, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ (ওহী) হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য।" *(সূরা কাহফ ১১০ আয়াত)*

আবার একথা সর্বজনবিদিত যে, রসূল ﷺ অন্যান্য মানুষের মতই পিতা-মাতার ঔরস হতেই সৃষ্টি। কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহর তরফ হতে ওহী দ্বারা মনোনীত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহামানুষ।

তদনুরূপ মীলাদে বলা হয় যে, 'আল্লাহ মুহাম্মাদের জন্যই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।" (এ বিষয়ে হাদীসগুলো জাল ও গড়া।) অথচ কুরআন এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ বলেন, "আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" *(সূরা যারিয়াত ৫৬ আয়াত)*

তিনিই জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ মনে করে অনেক মীলাদী গেয়ে থাকে,

'ফুল বাগানে ফুটল নবীন ফুল।
সে ফুল যদি না ফুটিত, কিছুই পয়দা না হইত-
না করিত আরশ-কুর্সী জলীল রব্বুল।
ফুল বাগানে ফুটল নবীন ফুল।'

খ্রিষ্টানরা আন্দাজে ২৫শে ডিসেম্বর যীসু খ্রিষ্টের জন্মোৎসব (মীলাদ, বড়দিন বা ক্রিষ্টমাস ডে) এবং তাদের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মদিন (বার্থডে') বড় আনন্দের সাথে পালন করে থাকে। মুসলিমরা তাদের মত আনন্দে মাতোয়ারা হওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিদআত ওদের নিকট হতেই গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই এরাও ওদের মত নবীদিবস (ঈদে-মীলাদুন-নবী) এবং পরিবারের সভ্যদের (বিশেষ করে শিশুদের) 'হ্যাপি বার্থ ডে'র অনুষ্ঠান উদ্যাপন করে থাকে। অথচ তাদের রসূল তাদেরকে সাবধান করে বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই একজন।" *(আবূদাঊদ)*

এই নবীদিবস উপলক্ষে কৃত অনুষ্ঠানে বেশীর ভাগই নারী-পুরুষ ও যুবক-যুবতীর অবাধ মিলামিশা ঘটে থাকে; অথচ এ কাজকে ইসলাম অবৈধ ঘোষণা

জাগরণ করে থাকে, যার ফলে কমপক্ষে ফজরের নামায জামাআতে না পড়ে নষ্টই করে ফেলে অথবা তাদের নামাযই ছুটে যায়।

ঈদে মীলাদ বহু সংখ্যক লোক উদ্‌যাপন করে থাকলেও (সত্য নিরূপণে) সংখ্যাধিক্য বিবেচ্য নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। তারা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করে। আর তারা কেবল অনুমানভিত্তিক কথাই বলে। *(সূরা আনআম ১১৬ আয়াত)*

হুযাইফা বলেন, 'প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা, যদিও সকল লোকেই তা সৎকর্ম বলে ধারণা (বা আমল) করে থাকে।'

অতএব সংখ্যাধিক্য নয়; বরং দলীলই প্রমাণ করবে, তা বিদআত অথবা সুন্নাত। মুখের দাবীতে, বাগাড়ম্বরের দাপটে কিছু প্রমাণ করা যায় না। কিছু প্রমাণ করতে হলে সঠিক দলীল ও যুক্তি থাকা প্রয়োজন। মহান আল্লাহ ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান সম্বন্ধে বলেন,

﴿ وَقَالُوا۟ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿١١١﴾ ﴾

অর্থাৎ, তারা বলে ইয়াহুদী অথবা খ্রিষ্টান হওয়া ছাড়া অন্য কেউ কখনও বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। এটা তাদের মিথ্যা আশা। বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে দলীল উপস্থিত কর। *(সূরা বাক্বারাহ ১১১ আয়াত)*

আর কোন কাজকে ভালো মনে করেই করলে তা করা যায় না। আল্লাহর নবী ﷺ-এর জন্ম-কাহিনী শোনাবার, তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করার, তাঁর

করেছে।

নবীদিবস উদ্‌যাপনের সাজ-সরঞ্জাম যেমন; রঙিন কাগজ, মোমবাতি প্রভৃতি আড়ম্বরে (সারা বিশ্বে) যে অর্থ খরচ করা হয়, তা কয়েক মিলিয়নে গিয়ে পৌঁছে থাকে। অথচ পরে ঐ সব সাজ-সরঞ্জাম অনর্থক পানিতে ফেলে দেওয়া হয়। এতে লাভবান হয় তো শুধু কাফেররা; যারা তাদের দেশ হতে আমদানীকৃত ঐ সাজ-সরঞ্জামের মূল্য কুক্ষিগত করে। পক্ষান্তরে শরীয়ত আমাদেরকে অর্থ অপচয় করতে নিষেধ করেছে।

এই উপলক্ষে মঞ্চাদি বানাতে ও সাজাতে লোকেরা যা সময় নষ্ট করে তাতে অনেকে নামাযও ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বরং সত্য কথা এই যে, এ ব্যাপারে নামাযীদের তুলনায় বেনামাযীরাই বেশী আগ্রহ প্রদর্শন করে থাকে।

মীলাদের অনুষ্ঠান করতে গিয়ে অনেক সময় শহরের পথে ভিঁড় জমিয়ে জন-জীবন ব্যাহত করা হয়। সেই পথের রোগী হাসপাতালে যেতে পারে না, কর্মব্যস্ত মানুষ নিজ কর্ম সারতে সক্ষম হয় না।

ওদের অনেকে বলে থাকে, 'আমরা মীলাদে রসূল ﷺ-এর জীবনচরিত আলোচনা করি।' কিন্তু বাস্তবে ওরা এমন সব কিছু করে ও বলে, যা তাঁর বাণী ও চরিতের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট করে উক্ত দিনে তাঁর জীবনচরিত আলোচনা করাও বিদআত। আর নবীর প্রেমিক তো সেই ব্যক্তিই যে বৎসরান্তে একবার নয় বরং প্রত্যহ তাঁর জীবন-চরিত আলোচনা ও পাঠ করে। জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে কেবল তাঁরই অনুসরণ করে। আর মাদ্রাসা ও মসজিদে প্রায় তো তাঁর জীবনের কথা আলোচিত হয়েই থাকে। এর জন্য 'মীলাদ' অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?

পরন্তু রবিউল আওয়াল; যে মাসে (এবং অনেকের মতে, যে দিনে) তাঁর জন্ম ঠিক সেই মাসেই (ও সেই দিনেই) তাঁর মৃত্যু। সুতরাং তাতে শোক-পালনের চেয়ে আনন্দ প্রকাশ নিশ্চয় উত্তম নয়। পক্ষান্তরে শোকপালনও কোন বিধেয় কর্ম নয়।

অধিকাংশ মীলাদভক্তরা ঐ তারীখে অর্ধরাত্রি (বরং তারও অধিক) পর্যন্ত

প্রতি দরূদ পড়ার, মানুষকে ধর্মের প্রতি আহবান করার আরো বহু সময় ও ক্ষেত্র আছে। কেবল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেন তা করতে হবে। তাছাড়া ভালোর এ পদ্ধতি কি আল্লাহর হাবীব ﷺ ও তাঁর অনুগত সাহাবায়ে কেরাম ﷵ-দের কি জানা ছিল না? কৈ তাঁরা তো করে বা বলে গেলেন না? নাকি আপনার হুজুরের ভালো বুঝার ক্ষমতাটা তাঁদের চাইতেও বেশী। আর তা হলে হুজুরের ভ্রষ্টতার ব্যাপারে কি আপনার এখনো কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "আমার পূর্বেও যে সকল আম্বিয়া ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের উপর এই দায়িত্ব ছিল যে, তাঁরা যা উম্মতের জন্য উত্তম বলে জানবেন, তা তাদেরকে অবহিত করবেন এবং যা তাদের জন্য মন্দ বলে জানবেন, তা হতে তাদেরকে সতর্ক করবেন।" *(মুসলিম ১৮৪৪নং)*

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, মীলাদে যে সকল কাজ করা হয়, তা তো ভাল কাজ, অতএব ভালো কাজে ক্ষতি কি?

কিন্তু কাজ ভালো হলেই যে ইচ্ছামত করা যাবে তা নয়। শরীয়তের নির্দেশিত পদ্ধতি, পরিমাণ, স্থান ও কাল হিসাবে না করলে কোন কাজ ভাল হলেও তা আসলে ভাল নয়। যিক্র ভাল হলেও নেচে নেচে যিক্র ভাল নয়। নামায ভাল, কিন্তু অসময়ে নামায ভাল নয়। সদকাহ করা ভাল, কিন্তু অপাত্রে সদকাহ করা ভাল নয়। হজ্জ করা ভাল, কিন্তু যিলহজ্জের ঐ নির্দিষ্ট দিন ছাড়া অন্য সময় হজ্জ ভাল নয়, মকবূল নয়। তওয়াফ ভাল, কিন্তু কা'বা ছাড়া অন্য কিছু তওয়াফ নিশ্চয় ভাল নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, মীলাদ উপলক্ষে যে সকল নেক কাজ করা হয়, তা আসলে নেক হলেও, বিদআতী মীলাদের চক্রে পড়ে তাতে কোন নেকী থাকবে না; সে সবে কোন সওয়াব পাওয়া যাবে না।

একদা এক ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে দু-রাকআত নফল নামায আদায় করতে চাইলে হযরত আলী ﷺ তাকে নিষেধ করলেন। লোকটি যুক্তি দেখিয়ে বলল, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! নামায তো গোনাহর কাজ নয়। (এটা তো ভালো কাজ।)' হযরত আলী জওয়াবে বললেন, 'যে কাজ আল্লাহর নবী

করেননি, বা করতে উৎসাহ দেননি, সে কাজে আল্লাহ তাআলা কোন সওয়াব দেন না। ---বরং আল্লাহর নবী ﷺ-এর তরীকার বিরোধিতা করার কারণে তোমাকে আল্লাহ তাআলা কঠিন আযাবে গ্রেফতার করতে পারেন।' *(মীলাদে মুহাম্মাদী ৭পৃঃ, মীলাদ প্রসঙ্গ, আসাদুল্লাহ আল-গালিব ১০পৃঃ)*

মীলাদ এল কোত্থেকে?

অনেকে প্রশ্ন করেন, মীলাদ যদি শরীয়তে না-ই থাকে, তাহলে তা এল কোত্থেকে?

সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদ (নবীদিবস) আবিষ্কার করেন ইরাকের ইরবিল শহরের আমীর (গভর্নর) মুযাফ্‌ফারুদ্দীন কূকুবুরী ঠিক হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে ৬০৪ (মতান্তরে ৬২৫) হিজরীতে। মিসরে সর্বপ্রথম চালু করে ফাতেমীরা; যাদের প্রসঙ্গে ইবনে কাষীর বলেন, "(ফাতেমী শাসকগোষ্ঠী) কাফের, ফাসেক, পাপাচার, ধর্মধ্বজী, ধর্মদ্রোহী, আল্লাহর সিফাত (গুণাবলী) অস্বীকারকারী ও ইসলাম অস্বীকারকারী মজূসী ধর্ম-বিশ্বাসী ছিল।" *(আল-বিদায়াহ অন-নিহায়াহ' ১১/৩৪৬)*

মীলাদের সময় তারা বিভিন্ন খানকাহে গান-বাজনার আসর বসাত। কোন কোন বছরে মুহার্রম ও সফর থেকেই মীলাদের আনুষ্ঠানিক মৌসম শুরু করে দিত। সেই উপলক্ষ্যে গরু-ছাগল যবাই করে খানা দেওয়া হত। কবি, গায়ক ও মীলাদপাঠক হুযুরদের সরগরম ভিঁড় জমে উঠত।

মীলাদ উপলক্ষ্যে মিথ্যা কাহিনী, গল্প ও কবিতা (না'ত-গজল) তৈরী করা হত। বহু হুযুর তার সপক্ষে বই লিখে তাদের সহযোগিতাও করেছিলেন। সর্বপ্রথম আবুল খাত্তাব নামক এক হুজুর 'আত্-তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীরিন নাযীর' নামক বই লিখে শাহ মুযাফ্‌ফারের খিদমতে পেশ করলে তিনি তাঁকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

ইমাম সুয়ূত্বী তাঁর 'আল-হাবী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মীলাদের আবিষ্কারক শাহ মুযাফ্‌ফার একদা এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেন। সেই ভোজ আয়োজনে ছিল পাঁচ হাজার ভোনা বকরী, দশ

হাজার মুরগী, একশত ঘোড়া, এক লক্ষ মখন এবং হালোয়ার ত্রিশ হাজার পাত্র। সূফীদেরকে সেই অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিয়ে গজল-গীতের অনুষ্ঠান চালু হয়; যা যোহর থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত চালানো হয়। আর সেই অনুষ্ঠানে নাচনে-ওয়ালাদের সাথে তিনি নিজেও নাচেন!

অতঃপর সরকারের ভয়ে সত্য প্রকাশ করতে উলামাদের ত্রুটি হলে মীলাদ একটি ধর্মীয় রূপ ধারণ করে নেয়। হযরত ফাতেমার কেউ না হয়েও 'ফাতেমী' নাম নিয়ে এবং উক্ত শ্রেণীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ লোকের মন লুটে তারা রাজত্ব করে গেছে।

অনেকে বলেন যে, মীলাদে মোস্তফা একটি নব্য আবিষ্কার; যা আজ থেকে প্রায় বার শত বছর পূর্বে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে শায়খ উমার বিন মুহাম্মাদ সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'বিদআত' বলা হয়।

কথিত আছে যে, মাওসেলের অধিবাসী উক্ত উমার বিন মুহাম্মাদ নাকি খুবই আশেকে রসূল ও আল্লাহর অলী ছিলেন। তিনি রসূল-প্রেমে একান্ত অনুরাগের বশে এ মীলাদ তথা রসূল ﷺ-এর জন্ম-বৃত্তান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনায় ব্রতী হন। বিখ্যাত সীরাতে শামী গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করা হয়েছে। *(দেখুনঃ ছহীহ মাকছুদে মু'মেনীন ৩৬৯পৃঃ)*

মীলাদ করা কি মহানবী ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন?

মীলাদ নিঃসন্দেহে যে বিদআত, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যদি কেউ বলেন যে, 'নবীদিবস'-এর মাধ্যমে নবীর মহব্বত প্রকাশ করা হয়। তাহলে তাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসার ধরন জেনে নেওয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "(হে নবী!) বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ

পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি। *(বুখারী)*

উক্ত আয়াত বিবৃত করে যে, রসূল ﷺ-এর আনীত বিষয়ের অনুসরণ করে এবং তিনি মানুষের জন্য যা বর্ণনা করে গেছেন সেই সহীহ হাদীসসমূহে উল্লেখিত তাঁর আদেশের আনুগত্য করে ও নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করে, তাঁর কথার উপর অন্য কারো কথাকে প্রাধান্য না দিয়ে, তাঁর শরীয়তে কোন প্রকার ভেজাল প্রবিষ্ট না করেই আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা লাভ হয়। অন্যথা তাঁর পথ-নির্দেশের অনুগামী না হয়ে এবং তাঁর আদেশ ও আদর্শের অনুবর্তী না হয়ে কেবল টানা-টানা ও ভঙ্গিমাপূর্ণ কথায় (বুলিতে), গজল ও গীতিতে, শিকী না'ত ও মনগড়া দরূদে তাঁর মহব্বত লাভ হয় না।

আর উক্ত সহীহ হাদীস বর্ণনা করে যে, মুসলিমের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে রসূল ﷺ-কে এমন ভালোবেসেছে যা তার পিতা, সন্তান ও সমস্ত মানুষ, এমনকি নিজেকে যেমন ভালোবাসে তার চেয়েও অধিক গাঢ় ও দৃঢ় হয়; যেমন অন্য এক হাদীসে এর নির্দেশ এসেছে। আর ভালোবাসার প্রভাব তখনই অভিব্যক্ত হয়, যখন রসূল ﷺ-এর আদেশ ও নিষেধ এবং মনের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও তার পরিবেশের সমস্ত মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্খা পরস্পর-বিরোধী ও ভিন্নমুখী হয়। সুতরাং সে যদি সত্য ও প্রকৃত রসূল-প্রেমিক হয় তবে তাঁর আদেশ-পালনকে প্রাধান্য দেয় এবং তার নিজ মন, স্ত্রী-পরিজন, খেয়ালখুশী ও সকল মানুষের বিরোধিতা করে। আর যদি সে কপট ও ভন্ড প্রেমিক হয়, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করে এবং তার শয়তান ও মন-প্রবৃত্তির বাধ্য ও অনুগত দাস হয়।

যদি আপনি কোন মুসলিমকে প্রশ্ন করেন যে, 'তুমি কি তোমার রসূলকে ভালোবাস? তখন চট্ করে হয়তো সে আপনাকে বলবে, 'অবশ্যই। আমার জান ও মাল তাঁর জন্য কুরবান (উৎসর্গ) হোক।' অতঃপর যদি তাকে প্রশ্ন করেন, 'তাহলে তুমি তোমার দাড়ি চাঁছ কেন? আর অমুক অমুক বিষয়ে তুমি তাঁর বাহ্যিক বেশভূষা, চরিত্র, তওহীদ প্রভৃতিতে তাঁর অনুকরণ কর না

করেছি এবং আমার উপর সর্বপ্রথম কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।” অন্য এক বর্ণনায় আছে, “ঐ দিনে আমি (নবীরূপে) প্রেরিত হয়েছি।” *(আহমাদ ৫/২৯৭, ২৯৯, মুসলিম ১১৬২, আবূ দাউদ ২৪২৫নং)*

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ঐ রোযা রেখে তিনি স্বীয় জন্মদিন পালন করেছেন। বরং রোযা রাখার কারণ বর্ণনা করে তিনি আরো বলেন, সোম ও বৃহস্পতিবার (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ করা হয়। তাই আমি এটা পছন্দ করি যে, আমার রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল (তাঁর নিকট) পেশ করা হোক।” *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১০২৭নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন, “প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবারে (মানুষের) সকল আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। আর (ঐ উভয় দিনে) আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে মার্জনা করে দেন যে কোন কিছুকে তাঁর অংশী স্থাপন করে না। তবে সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যার নিজ ভায়ের সহিত বিদ্বেষ থাকে; এই দুই ব্যক্তির জন্য (ফিরিশ্তার উদ্দেশ্যে) তিনি বলেন, উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও। উভয়ের মিলন না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে অবকাশ দাও।” *(মুসলিম ২৫৬৫ নং, প্রমুখ)*

অতএব কেবল ১২ই রবীউল আওয়াল নবীদিবসের আনন্দ উৎসব করে নয়; বরং তাঁর সুন্নত মোতাবেক তাঁর জন্মদিন প্রত্যেক সোমবারে (এবং অনুরূপ বৃহস্পতিবারে) রোযা রেখে নবী ﷺ-এর মহব্বত প্রকাশ করতে হবে।

পক্ষান্তরে মীলাদকে যারা বিদআত বলে, তাদের বুকে নবীর প্রতি মহব্বত নেই - তা নয়। আল্লাহর কসম! মীলাদ পড়াই যদি মহানবী ﷺ-এর প্রতি মহব্বত প্রকাশের কোন শরয়ী পদ্ধতি হত, তাহলে এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, তারাই সবার আগে মীলাদ সবার চেয়ে সুন্দর করে পাঠ করত। এর চাইতে বড় মহব্বতের পরিচয় আর কি হতে পারে যে, তারা প্রতি পদক্ষেপে তাঁর সুন্নাহকে অনুসরণ করার চেষ্টা করে এবং তাঁর শরীয়তে নকল অনুপ্রবেশ করার সকল দুয়ার বন্ধ করে? এই মহব্বতই কি আসল মহব্বত নয়?

কেন?'

তখন সে এই বলে আপনাকে উত্তর দেবে, 'ভালোবাসা অন্তরে হয়। আমার অন্তর ভালো। আলহামদু লিল্লাহ!!'

কিন্তু আমরা তাকে বলব, 'তোমার অন্তর যদি ভালো হত, তাহলে তার প্রভাব ও প্রতিকৃতি তোমার দেহে পরিস্ফুট হত। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “জেনে রাখ, দেহের মধ্যে এমন এক মাংস-পিন্ড আছে, যা ভালো হলে সারা দেহ ভালো হবে এবং তা খারাপ হলে সারা দেহ খারাপ হবে। শোন! তা হল হৃৎপিন্ড (অন্তর)।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও মহব্বত মুসলিমের ঈমানের পরিপূরক বিষয়। কোন মুমিন ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তার যাবতীয় প্রিয় বস্তু, নেতৃত্ব-সম্মান-গদি, ধন-সম্পদ, বাসস্থান, সকল মানুষ, নেতা-সর্দার, আত্মীয়-স্বজন, ভ্রাতা-ভগ্নি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, মাতা-পিতা এবং নিজের জীবন থেকেও অধিক ভালোবেসেছে। *(দ্রষ্টব্যঃ সূরা তাওবাহ ২৪ আয়াত, বুখারী ১৫, মুসলিম ৪৪নং)*

এই ভালোবাসা বা মহব্বত শুধু দরূদ পাঠে বা (মনগড়া) মীলাদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয় না। বরং এই মহব্বতের জন্য একান্ত জরুরী তাঁর ইত্তেবা ও অনুসরণ করা। তাঁর আদর্শে আদর্শবান হওয়া। তাঁর যাবতীয় আদেশাজ্ঞা যথাসাধ্য পালন করা এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)* তাঁর জন্মদিনে উৎসব করে আনন্দ উপভোগ করে নয়; বরং তিনি যে জন্য বা যার জন্য জন্ম নিয়েছিলেন, তা বরণ ও পালন করে আনন্দ উপভোগ করা।

আল্লাহ সকল মুসলিমকে সঠিক পথে চলার তওফীক দিন। আমীন। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/৪১, ৯৩, ১০৯, ১৩১, মাজমূউ ফাতাওয়া, শায়খ ইবনে উষাইমীন ২/২৯৮ দ্রষ্টব্য)*

তাঁর জন্মদিন সংক্রান্ত যে ইঙ্গিত তিনি করেছেন, তা হল আবূ কাতাদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস; তিনি বলেন, 'সোমবার রোযা রাখার ব্যাপারে নবী ﷺ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, “এটা হল সেই দিন, যে দিনে আমি জন্ম লাভ

কিয়াম প্রসঙ্গ

আমরা আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করি। সেই দরূদ, যা তিনি সাহাবায়ে কেরামগণকে শিখিয়ে গেছেন এবং পরবর্তী অনুগামীগণ যে দরূদ তাঁর উপর পাঠ করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করার সময় 'কিয়াম' করা (দন্ডায়মান হওয়া) সাহাবা ও তাবেঈনদের আমল নয়।

মীলাদীরা মনে করে যে, মহানবী ﷺ তাদের মীলাদে উপস্থিত হন। আর তার মানেই হল, দুনিয়ার কোন্ দেশে কোন সময়ে মীলাদ হচ্ছে, তা তিনি জানতে পারেন এবং একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় মীলাদ হলেও তিনি একই সময়ে সকল জায়গাতেই উপস্থিত হতে পারেন। অর্থাৎ তিনি গায়েব জানেন এবং একই সময়ে একাধিক জায়গায় বিরাজমান হতে পারেন। তাদের যুক্তিকে ১০ জায়গায় ১০টি বা তারও বেশী থালায় পানি রেখে প্রত্যেক থালায় যেমন আকাশের সূর্য বা চাঁদকে দেখা যায়, তেমনি তাঁর উদাহরণ।

কিন্তু আমরা জানি যে, তিনি হাযির-নাযির নন। (ইল্ম সহ) হাযির ও নাযির তো মহান আল্লাহ। তিনি কোন মহফিলে (ইন্তেকালের পর) উপস্থিত হন না। উম্মতি যে যেখান থেকেই দরূদ ও সালাম পাঠ ও পেশ করে, নির্দিষ্ট ফিরিশ্তা সেই দরূদ আল্লাহর নবীর কাছে পৌঁছিয়ে থাকেন।

অভ্যাসগতভাবে মীলাদের শেষে লোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে যায় (কিয়াম করে)। কেননা, তাদের অনেকের বিশ্বাস যে, রসূল ﷺ মীলাদ অনুষ্ঠানে (এর শেষে?) উপস্থিত হন। অথচ এমন বিশ্বাস স্পষ্ট অলীক। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾

অর্থাৎ, ওদের (পরলোকগত ব্যক্তিদের) সম্মুখে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত বারযাখ (ইহকাল ও পরকালের মাঝে এক যবনিকা) থাকবে। *(সূরা মু'মিন ১০০ আয়াত)* অর্থাৎ, তাঁরা বিরাজমান হতে পারবেন না।

তাছাড়া এ কথা থেকে বুঝা যায়, মীলাদীরাও গায়েব জানে। তা না হলে

আল্লাহর রসূল ﷺ কখন হাযির হচ্ছেন - তা জানবে কি করে? আর মীলাদের শেষে উপস্থিত হওয়ার পশ্চাতে কি কোন যুক্তি থাকতে পারে? আর রসূল ﷺই বা জানবেন কি করে যে, অমুক জায়গায় মীলাদ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং অমুক সময়ে তা শেষ হচ্ছে? আল্লাহর নবী ﷺ তো গায়েব জানতেন না। তিনি ইন্তিকালের পর তিনি বা তাঁর রূহ তো কোন স্থানে হাযির হতে পারে না। আর তিনি মীলাদের শেষেই বা উপস্থিত হবেন কেন? পক্ষান্তরে তাঁর গায়েব জানা অথবা হাযির-নাযির জানা অথবা ইন্তিকালের পরে বারযাখ ছাড়া ইহজগতের অন্য কোথাও হাযির হওয়াতে বিশ্বাস রাখা তো শির্ক ও কুফ্রী।[3]

পক্ষান্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ জীবদ্দশাতেও নিজের জন্য সাহাবাদের দন্ডায়মান হওয়াকে পছন্দ করতেন না।

আবূ উমামাহ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, "তোমরা দাঁড়ায়ো না; যেমন অনারব (পারস্যের) লোক তাদের বড়দের তা'যীমে উঠে দাঁড়ায়।" *(আবূ দাঊদ ৫২৩০, ইবনে মাজাহ ৩৮৩৬নং, হাদীসটির সনদ যয়ীফ; কিন্তু অর্থ সহীহ, দেখুনঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৩৪৬নং, অবশ্য সহীহ হাদীসে নামাযের ভিতরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।)*

আনাস বিন মালেক ؓ বলেন, "ওঁদের (সাহাবাদের) নিকট রসূল ﷺ অপেক্ষা অন্য কেউ অধিক প্রিয় (ও শ্রদ্ধেয়) ছিল না। কিন্তু ওঁরা যখন তাঁকে দেখতেন তখন তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। কারণ এতে তাঁর অপছন্দনীয়তার কথা তাঁরা জানতেন।" *(সহীহ, আহমদ ও তিরমিযী)*

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, লোক তার জন্য দন্ডায়মান হোক, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

উক্ত হাদীসদ্বয় হতে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে প্রবেশের সময়

([3]) তিনি যে গায়েব জানতেন না, তিনি হাযির-নাযির নন এবং তিনি ইহ-জগতে বেঁচে নেই, সে সব কথা 'তওহীদ'-এ দেখুন।

তার জন্য লোকেরা প্রত্যুত্থান করুক এ কথা পছন্দ ও কামনা করে সে জাহান্নাম প্রবেশের সম্মুখীন হয়। সাহাবা ﷺ রসূল ﷺ-কে অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁকে দেখলে উঠে দন্ডায়মান হতেন না। কারণ তাঁর জন্য উঠে দন্ডায়মান হওয়া তাঁর নিকট যে অপছন্দনীয় তা তাঁরা জানতেন।

পক্ষান্তরে লোকেরা কিছু সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের জন্য উঠে দন্ডায়মান হওয়াটাকে অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছে, বিশেষ করে শায়খ যখন দর্স দেবার জন্য অথবা কোন স্থান যিয়ারতের জন্য প্রবেশ করেন, তদনুরূপ শিক্ষক যখন ক্লাসরুমে প্রবেশ করেন, তখন দেখা মাত্রই ছাত্রবৃন্দ তাঁর সম্মানার্থে উঠে দন্ডায়মান হয়। আর এদের মধ্যে যদি কেউ খাড়া হতে না-ই চায়, তাহলে শিক্ষক ও গুরুর প্রতি তার বেআদবী ও অসম্মান দরুন তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হয়।

অনেকে বলে থাকে, 'আমরা শায়খ বা শিক্ষকের জন্য দন্ডায়মান হই তাঁদের ইল্‌মের সম্মানার্থে।' কিন্তু আমরা তাদেরকে বলব যে, তোমরা কি রসূল ﷺ-এর ইল্‌ম ও তাঁর প্রতি সাহাবাবর্গের আদব ও সম্মান প্রদর্শনে সন্দেহ পোষণ কর? কই তা সত্ত্বেও তাঁরা তো তাঁর জন্য দন্ডায়মান হননি। পরন্তু ইসলাম প্রত্যুত্থান ও কিয়াম দ্বারা সম্মান প্রদর্শন গণ্য করেনি। সম্মান তো আনুগত্য, আজ্ঞাপালন, সালাম (অভিবাদন) ও মুসাফা (করমর্দন) এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

আর এ বিষয়ে কবি শওকীর কথা স্বীকার্য নয় ঃ

'উঠে দন্ডায়মান হও শিক্ষকের জন্য
ও তাঁর পরিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন কর,
কারণ শিক্ষক প্রায় রসূল হওয়ার কাছাকাছি!'

যেহেতু এ কথা বিচ্যুতিহীন রসূল ﷺ-এর বাণীর পরিপন্থী, যিনি দন্ডায়মান হওয়াকে অপছন্দ করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা পছন্দ করে, সে পছন্দ তার জাহান্নাম যাবার কারণ হবে।

কিছু ওলামাদের হয়তো বলতে শুনবেন যে, রসূল ﷺ-এর কবি হাস্‌সান ﷺ বলেছিলেন, "প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হওয়া আমার জন্য ফরয।" তো এ কথা সঠিক ও শুদ্ধ নয়। *(ফির্কাহ নাজিয়াহ দ্রষ্টব্য)*

কিয়ামে দরূদের যে শব্দছন্দ তা শুনে মনে হয় যে, তা 'মেড ইন্ ইন্ডিয়া।' নবীর শানে সালাম পাঠাতে আরবীতে 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' বলা হয় না; বলা হয়, 'আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু' যেমন আমরা নামাযের 'আত্-তাহিয়্যাত'-এ পাঠ করে থাকি। অনেকে বলে থাকেন যে, আসলে উপমহাদেশের একজন আলেম ছিলেন। যিনি নাকি নবীর ধ্যানে কখনো কখনো কল্পনায় তাঁকে যেন সামনেই আসতে দেখতেন। আর তাই তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে ঐ সালাম পেশ করতেন। অতঃপর তাই পরবর্তীতে তাঁর ছাত্ররা ওস্তাদের দেখাদেখি 'কিয়াম'রূপ বিদআত প্রচলিত করেন। সুতরাং তা যদি সত্য হয়, তাহলে তা সকলের জন্য পালনীয় বিধেয় বা ভালো আমল কি করে হতে পারে? যেটা উপমহাদেশে তৈরী, সেটা কি শরীয়তের পালনীয় কিছু হতে পারে?

বিধেয় ও বাঞ্ছিত (কিয়াম) প্রত্যুত্থান

কিছু সহীহ হাদীস এবং সাহাবাগণের আমল আগন্তুকের প্রতি উঠে দন্ডায়মান হতে নির্দেশ করে। আসুন! আমরা সেই হাদীসগুলিকে বুঝি ঃ-

১। রসূল ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা তাঁর নিকট এলে তিনি তাঁর প্রতি এবং তিনি ফাতেমার নিকট এলে তিনিও পিতার প্রতি উঠে দন্ডায়মান হতেন। যেহেতু তা হল মেহেমানের সাক্ষাৎ ও খাতিরের উদ্দেশ্যে তার প্রতি উঠে দন্ডায়মান হওয়া। রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

কিন্তু এই উদ্দেশ্যে কেবল মেজবান (আপ্যায়নকারী গৃহস্থ)ই উঠে দন্ডায়মান হবে।

২। "তোমরা তোমাদের সর্দারের প্রতি উঠ।" *(বুখারী ও মুসলিম)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "---এবং ওকে (সওয়ারী) হতে নামাও।"

এই হাদীসের পটভূমিকা এই যে, (খন্দকের যুদ্ধ শেষে) সা'দ ﷺ আহত ছিলেন। ইয়াহুদীদের ব্যাপারে বিচার করার উদ্দেশ্যে রসূল ﷺ তাঁকে আহূত করেন। তাই তিনি এক গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করে যখন তাঁর নিকট পৌঁছলেন তখন রসূল ﷺ আনসারকে লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা তোমাদের সর্দারের প্রতি উঠ এবং ওঁকে নামাও।" সুতরাং (কিছু) সাহাবা উঠে গিয়ে তাঁকে গর্দভ থেকে নামালেন। এই দন্ডায়মান আনসারের সর্দার সা'দ ﷺ-এর সাহায্যার্থে বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ তিনি গর্দভের পৃষ্ঠে আহতাবস্থায় বসে ছিলেন; যাতে (নামতে গিয়ে) পড়ে না যান। পক্ষান্তরে রসূল ﷺ এবং অবশিষ্ট সাহাবাবৃন্দ উঠে দন্ডায়মান হননি।

৩। বর্ণিত যে, সাহাবী কা'ব বিন মালেক যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন সাহাবাগণ উপবিষ্ট ছিলেন। জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার পর তাঁর তওবা কবুল হওয়ার শুভসংবাদ নিয়ে তালহা তাঁর প্রতি উঠে ছুটে পৌঁছলেন। সুতরাং কোন দুঃখিত ব্যক্তির অন্তরে আনন্দ আনয়ন এবং আল্লাহর তরফ থেকে তার তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করার উদ্দেশ্যে উঠে দন্ডায়মান হয়ে তার নিকট যাওয়া বৈধ ছিল।

৪। সফর হতে আগন্তুক ব্যক্তির সহিত মুআনাকা (কোলাকুলি) করার উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হওয়া বৈধ।

৫। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উক্ত হাদীসগুলির প্রত্যেকটিতে 'তোমাদের সর্দারের প্রতি, তালহার প্রতি, ফাতেমার প্রতি--' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয়েছে এই হাদীসসমূহ (আগন্তুকের প্রতি) উঠে দন্ডায়মান হওয়ার বৈধতা প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে দন্ডায়মান হতে নিষেধকারী হাদীসগুলিতে 'Ø(তার জন্য বা

উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হওয়া) শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আর 'Ø(তার প্রতি উঠা, অর্থাৎ তার সাহায্য ও খাতিরার্থে তার নিকট সত্বর উঠে যাওয়া) এবং 'Ø (তার জন্য বা উদ্দেশ্যে উঠা, অর্থাৎ তার তা'যীম ও সম্মানার্থে স্বস্থানে উঠে দন্ডায়মান হওয়া)র মাঝে বিরাট পার্থক্য আছে। *(ফির্কাহ নাজিয়াহ দ্রষ্টব্য)*

বলাই বাহুল্য যে, উক্ত বৈধ কিয়াম দ্বারা মীলাদে মনগড়া দরূদ পড়ার সময় কিয়াম করা বৈধ প্রমাণ করা যায় না।

মীলাদে প্রচলিত কতিপয় মনগড়া হাদীস ও রূপকথা

১। "আল্লাহ তাঁর নিজ নূর (জ্যোতির) এক মুষ্ঠি ধারণ করে তার উদ্দেশ্যে বলেন, 'তুমি মুহাম্মাদ হয়ে যাও।"

২। "আল্লাহ প্রথম যা সৃষ্টি করেন তা হল তোমার নবীর নূর, হে জাবের!"

৩। নূরে মুহাম্মাদী হতে আরশ-কুর্সী, বেহেশ্ত-দোযখ, আসমান-যমীন যাবতীয় সব কিছুই সৃষ্টি।

৪। আদম সৃষ্টির ৭০ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহপাক নিজ নূর থেকে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে মুআল্লায় লটকে রাখেন।

৫। আদম সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন।

৬। "আমি গুপ্ত ধন-ভান্ডার ছিলাম।"

৭। "আদম যখন ত্রুটি করে বসলেন তখন তিনি বললেন, 'হে প্রতিপালক! আমি মুহাম্মাদের অসীলায় প্রার্থনা করছি আমাকে ক্ষমা করে দাও----।"

৮। মি'রাজের সময় আল্লাহপাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়!

৯। মহানবীর জন্মের খবরে খুশী হয়ে আঙ্গুল উঁচু করার কারণে এবং জন্ম-সংবাদদাত্রী দাসী সুওয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে জাহান্নামে আবূ লাহাবের মাঝের দুটি আঙ্গুল পোড়ে না এবং প্রতি সোমবার রসূলের

থাকে। আর সেই সাথে ঐ তারীখে হালোয়া-রুটি খেয়ে আনন্দ করার একটি সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

এই দিনই হল মহানবী ﷺ-এর জন্মদিন। আর সে জন্য এই দিনেই ওরা 'ঈদে-মীলাদুন্নাবী' ও পালন করে থাকে; যা বিদআত এবং দলীল ও ভিত্তিহীন কর্ম। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা 'নবীদিবস' শিরোনামে দ্রষ্টব্য।

সতর্কতার বিষয় যে, মহানবী ﷺ-এর জন্মদিনকে কেন্দ্র করে যেমন অতিরঞ্জিত কাল্পনিক বহু ইতিহাস বর্ণনা করা হয়, তেমনিই তাঁর তিরোভাবকে কেন্দ্র করেও বহু কাল্পনিক আজগুবি ইতিহাস বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তার কিছু নমুনা রয়েছে কবি নজরুলের কবিতায় ঃ-

'পাতাল গহ্বরে কাঁদে জিন, পুনঃ ম'লো কি রে সুলাইমান?
বাচ্চারে মৃগী দুধ নাহি দেয়, বিহগীরা ভোলে গান।
কুলপাতা যত খ'সে পড়ে, বহে উত্তর-চিরা বায়ু,
ধরণীর আজ শেষ যেন আয়ু, ছিঁড়ে শিরা গেছে স্নায়ু।
---শোকে উন্মাদ ঘুরায় উমর ঘূর্ণির বেগে ছোরা,
বলে "আল্লাহর আজ ছাল তুলে নেবে মেরে তেগ, দেগে কোঁড়া!"
---খোদা খোদা সে নির্বিকার,
আজ টুটেছে আসনও তাঁর!
---'খোদা, একি, তব অবিচার!--'

এমন অতিরঞ্জিত অসমীচীন অভিযোগ-ভরা কল্পিত কথা কবিরাই বলতে পারেন। তবে একজন মুসলিমের এই শ্রেণীর কথা বিশ্বাস রাখা আদৌ বৈধ নয়।

কুন্ডা

২২ রজব হযরত ইমাম জা'ফর সাদেক (রঃ)এর ওফাত দিবস। এই দিনে তাঁর নামে ফাতেহা নিয়ায করে পুণ্য লাভ হয় বলে ধারণা করে থাকে অনেক মুসলমান। তাঁর নামে মাটির হাঁড়িতে ক্ষীর-মিঠাই নিয়ে ফাতেহা পড়ে বিলিয়ে

জন্মদিনে জাহান্নামে তার শাস্তি মকুব করা হয়।

১০। মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত থেকে বিবি মরিয়ম, আসিয়া, হাজেরা দুনিয়ায় নেমে এসে সকলের অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

১১। মহানবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার প্রতিমাগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ে, রোমের অগ্নিপূজকদের অগ্নি দপ্ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদী-প্রবাহ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

এখানে কোন মন্তব্য না করে কেবল মহানবী ﷺ-এর দু'টি সহীহ হাদীস স্মরণ করে দিই; তিনি বলেন,

"যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নাম বানিয়ে নিল।" *(বুখারী ১১০, মুসলিম ৩ নং)*

"যে ব্যক্তি আমার তরফ হতে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে মনে মনে জানে যে, তা মিথ্যা। তবে সেও মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।" *(সহীহ মুসলিমের ভূমিকা, প্রভৃতি)*

পরিশেষে বলি যে, অমুসলিমদের সাথে পাল্লা দিয়ে ধর্মকে কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমিত ও বন্দী করার মাঝে কোন মঙ্গল নেই। মঙ্গল আছে সুন্নাহর অনুসরণ এবং বিদআত বর্জনের মাঝে। সুতরাং মুসলিম হুশিয়ার!

ফাতিহা দোয়াযদহম

ফারসী ভাষায় 'দোয়াযদহম' মানে হল ১২তম। রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারীখে রসূলে কারীম ﷺ মদীনা হতে বিদায় নিয়েছিলেন বলে মুসলিম জাহানের বহু মুসলমান এই দিনটিকে 'ফাতিহা দোয়াযদহম' নামে অভিহিত করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে থাকে। চাঁদ দেখা হতে শুরু করে কুরআন শরীফ পাঠ, দান-খয়রাত, মীলাদ-মাহফিল, দরূদ শরীফ, নফল নামায ও গরীব-মিসকীনদিগকে ভোজ দান অতীব নেকীর কাজ বলে গণ্য করে

দেওয়াকেই 'কুন্ডা' বলা হয়।

এটিও অন্যান্য মৃত্যুবার্ষিকীর মত একটি বিদআতী প্রথা।

শবে-মি'রাজ

প্রতি বৎসর ২৭শে রজব বিভিন্ন দেশে বহু মুসলমান ভক্তি ও উদ্দীপনার সাথে 'শবে-মিরাজ' পালন করে থাকেন। তাঁরা এই রাত্রে ইবাদত করেন (বিশেষ পদ্ধতিতে ১২ রাকআত নামায পড়েন, নামায শেষে ১০১ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে দুআ ও মুনাজাত করেন) এবং পরদিন রোযা রাখেন। কেউ কেউ ভাড়াটিয়া হুজুর দিয়ে মীলাদ পড়ান, ভাড়াটিয়া হাফেয দিয়ে কুরআনখানী বা শবীনা পাঠ করান। তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে এ সকল ইবাদত করেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন কারীমের শিক্ষা ও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিক্ষার আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে, তাঁদের এ সকল কর্ম অযৌক্তিক ও অবশ্য-বর্জনীয়। নিম্নের কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করুনঃ-

প্রথমতঃ ২৭শে রজব মি'রাজ হয়েছিল -এ কথা প্রমাণিত নয়।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে মহান আল্লাহ বিশেষ মর্যাদা দান করেন এবং এক রাতে তাঁকে মক্কা শরীফ থেকে বোরাকে করে জেরুজালেমের মসজিদে আকসায় এবং সেখান থেকে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে যান। মিরাজের এই ঘটনা পবিত্র কুরআনে ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও মি'রাজের তারীখ বলা হয়নি। মি'রাজ কোন তারীখে সংঘটিত হয়েছিল এ কথা পবিত্র কুরআনে বা কোন বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তা পালন করা তো দূরের কথা; রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ মি'রাজের তারীখ জানা বা জানানোর ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেননি। পরবর্তী যামানার ঐতিহাসিকগণ পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন, মিরাজ রবিউল আউওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

কেউ বলেছেন, মুহার্রাম মাসে। কেউ বলেছেন, রমযান মাসে। আবার কেউ বলেছেন রজব মাসে। তারীখের ব্যাপারেও বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। আর কোন মতটাই সঠিকরূপে প্রমাণিত নয়। এমতাবস্থায় ২৭শে রজবেই মি'রাজ হয়েছে বলে বিশ্বাস করা এবং এই দিন বা রাতকে কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা যে একেবারেই ভিত্তিহীন তা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি।

দ্বিতীয়তঃ শবে-মি'রাজ পালন করা বিদআত।

মি'রাজের তারীখ যদি নিশ্চিতরূপে জানা সম্ভব হতো, তাহলেও তা পালন করা আমাদের জন্য জায়েয হতো না। কারণ, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বা তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ কেউ কখনো শবে মি'রাজ পালন করেননি। আর আমাদের কর্তব্য হল তাঁদের অনুসরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, "যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছে প্রথম যুগের সেই মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ এবং যারা তাদেরকে উত্তমভাবে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার পাদদেশে বয়ে গেছে নদীসমূহ। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর এটাই হল সবচেয়ে বড় সফলতা।" *(সূরা তাওবাহ ১০০ আয়াত)* কাজেই আমরা যদি "সবচেয়ে বড় সফলতা" অর্জন করতে চাই, তাহলে তাঁদের অনুসরণ করতে হবে, তাঁরা যা করেছেন তা করতে হবে এবং তাঁরা যা করেননি তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

যে কাজ রাসূল ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ করেননি, সে কাজ ধর্মীয় কাজ হিসাবে বা সওয়াব লাভের কামনায় করলে তাকে "বিদআত" বলা হয়। আর বিদআত জঘন্য অন্যায়। কারণ, বিদআতী মূলতঃ এ কথা বলতে চায় যে, শবে মিরাজ পালন করা একটি ভাল কাজ। অথচ রাসূল ﷺ তা আমাদেরকে বলে যাননি। উপরন্তু যদি সবাই ইচ্ছামত মনগড়া ইবাদত করতে থাকে, তাহলে বিধেয়র সাথে অবিধেয় একাকার হয়ে যাবে এবং ইসলামের প্রকৃত রূপ বিকৃত হয়ে যাবে। এ জন্য রাসূল ﷺ আমাদেরকে বিদআত করা থেকে কঠোরভাবে

নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের এ বিষয়ে (দ্বীনে) যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, যে ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে, প্রত্যাখ্যাত হবে।" *(বুখারী, মুসলিম)* তিনি আরো বলেছেন, "সবচেয়ে উত্তম বাণী হল আল্লাহর বাণী। সবচেয়ে ভাল শিক্ষা ও তরীকা হল মুহাম্মাদের শিক্ষা ও তরীকা। আর সবচেয়ে খারাপ কর্ম হল নব-উদ্ভাবিত কর্ম। সকল প্রকার নতুন কাজই বিদআত। আর সর্বপ্রকার বিদআতই গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা।" *(মুসলিম)* কাজেই কোন বিদআতকে (বিদআতে হাসানাহ) ভাল বলার অবকাশ নেই।

পরিশেষে প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুন্নাহ ও শিক্ষার অনুসরণ করে চলা। তাঁর শিক্ষার বিপরীত সকল প্রকার বিদআতকে বর্জন করা এবং অপরকে এ পথে চলতে আহবান করা। (বিদআতী পরবের কোন দাওয়াত বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করা।) এ কথাই মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "মহাকালের শপথ! সমস্ত মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়।" *(সূরা আস্র)* মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, "ন্যায়, সৎ ও আল্লাহভীতির কাজে তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর এবং পাপ ও অন্যায় কাজে একে অপরের সহায়তা করো না।" *(সূরা মাইদাহ ২ আয়াত)*

হাদীস শরীফে মহানবী ﷺ বলেছেন, "ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা হল আন্তরিকতা, হিতাকাঙ্খা ও সৎ পরামর্শ দান করা।" সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কাদের জন্য?' তিনি বললেন, "আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সকল মুসলিম জনসাধারণের জন্য।" *(মুসলিম)*

(মাজাল্লাতুদ দা'ওয়াহ২৬/৬/১৪১৭ হিজরীর ১৫৬৬ সংখ্যা, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/৯৩, ১১৬, মাজমূউ ফাতাওয়া শায়খ ইবনে উষাইমীন ২/২৯৭ দ্রষ্টব্য)

এই মাসের ২৭ তারীখে (শবে মি'রাজে) এশা ও বিতরের মাঝে নাকি ৬

সালামে ১২ রাকআত নামায আছে। আর নামাযের পর ১০০ বার কলেমায়ে তামজীদ (?) এবং নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করতে হয়। এই দিন দান করতে হয়। ঐ দিনের রোযা এবং ঐ রাতের ইবাদত ১০০ বছর রোযা এবং ১০০ রাত ইবাদত করার সমান সওয়াব লাভ হয়! *(মু'জামুল বিদা' ৩৪১ ও ৩৪৫পৃঃ)*

আপনার মুর্শিদকে জিজ্ঞাসা করুন, এ সবের দলীল ও তার মান কি?

শবেবরাত

বারো মাসে তেরো পরবের মধ্যে হিজরী সনের শা'বান মাসের ১৫ তারীখে পালনীয় একটি বিদআতী পরব রয়েছে। প্রসিদ্ধ এই পরবকে 'শবেবরাত' বলা হয়।

প্রথম অমূলক ধারণা ও এর নামকরণ ঃ-

আরবীতে ঐ রাতটিকে 'লাইলাতুন নিসফি মিন শা'বান' (অর্ধ শা'বানের রাত্রি) এবং 'লাইলাতুল বারাআহ' (মুক্তির রাত) বলা হয়। কিন্তু ফারসীতে 'শব' মানে রাত্রি এবং 'বরাত' মানে ভাগ বা ভাগ্য। সুতরাং শবেবরাত মানে হয় ভাগ্যরজনী। মনে করা হয় যে, এই রাতে মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। মানুষের আয়ু ও রুযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মওত ও সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের রেজিষ্টার লিখা হয়। আর এই জন্য ফারসী-উর্দূ-বাংলাভাষীরা এর নাম দিয়েছেন 'শবেবরাত।'

এই ধারণার প্রমাণে কিছু দলীলও পেশ করা হয় যেমন ঃ-

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝٤ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝٥ ﴾

অর্থাৎ, আমি এ কুরআনকে বর্কতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি; আমি তো

সতর্ককারী। এই রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় - আমার আদেশক্রমে, আমি তো রসূল প্রেরণ করে থাকি। *(সূরা দুখান ৩-৫ আয়াত)*

তাবেয়ী ইকরামাহ থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেছেন, ঐ রাতটি হল শা'বানের ১৫ তারীখের রাত।

কিন্তু আগে-পিছা না ভেবে চোখ বন্ধ করে তাঁর কথা মতে ঐ রাতকে ভাগ্যরজনী বলে ধারণা করা সচেতন মানুষদের উচিত নয়। যেহেতু তাঁর উক্তির প্রতিকূলে রয়েছে কুরআন ও সুন্নাহ তথা আরো অন্যান্য উলামার উক্তি।

ইবনে কাষীর বলেন, তাঁর এ ধারণা সুদূরবর্তী। *(তাফসীর ইবনে কাষীর ৪/ ১৭৬)*

নিঃসন্দেহে উক্ত বর্কতময় রাত্রি হল 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' বা শবেকদর। আর শবেকদর নিঃসন্দেহে রমযানে। বলা বাহুল্য, ঐ রাত্রি শবেবরাতের রাত্রি নয়; যেমন অনেকে মনে করে থাকে এবং ঐ রাত্রে বৃথা মনগড়া ইবাদত করে থাকে। কারণ, কুরআন (লাওহে মাহফূয থেকে) অবতীর্ণ হয়েছে (অথবা তার অবতারণ শুরু হয়েছে) রমযান মাসে। কুরআন বলে,

(([illegible]))

অর্থাৎ, রমযান মাস; যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত)*

আর তিনি বলেন,

(([illegible]))

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি ঐ কুরআনকে শবেকদরে অবতীর্ণ করেছি। *(সূরা ক্বাদ্‌র ১-৩)*

আর হাদীস থেকে এ কথা বিদিত যে, শবেকদর হল রমযানে; শা'বানে নয়।

মুফাস্‌সির ইমাম কুরতুবী বলেন, উক্ত মত একটি বাতিল মত। --- সুতরাং যে মনে করবে যে, যে রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সে রাতটি রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসের রাত, সে আসলে আল্লাহর উপরে ভীষণভাবে মিথ্যা আরোপ করে। *(তাফসীর কুরতুবী ১৬/৮৬)*

ঐ রাতটিকে ভাগ্যরজনী প্রমাণ করার জন্য একটি মুরসাল (তাবেয়ী কর্তৃক

বর্ণিত অশুদ্ধ) হাদীস বর্ণনা করা হয়; যাতে বলা হয়েছে যে, "শা'বান থেকে আগামী শা'বান পর্যন্ত মৃত্যুসময় নির্ধারিত করা হয়। এমন কি কোন লোক বিবাহ-শাদী করে এবং তার সন্তান হয়, অথচ (ঐ বছরে) তার নাম মৃতদের তালিকাভুক্ত করা হয়।"

ইবনে কাষীর বলেন, 'মুরসাল হাদীস দ্বারা (কুরআন ও সুন্নাহর) স্পষ্ট উক্তির বিরোধিতা করা যাবে না।' *(তাফসীর ইবনে কাষীর ৪/ ১৭৬)*

তদনুরূপ তকদীর লিখার ব্যাপারে মা আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও সহীহ নয়। *(দেখুনঃ আলবানীর টীকা, মিশকাত ১/৪০৯)*

দ্বিতীয় অমূলক ধারণাঃ দুনিয়ার আসমানে আল্লাহর অবতরণ

মহান আল্লাহ শবেবরাতে নিচের আসমানে নেমে এসে বান্দাকে আহবান করতে থাকেন।

হযরত আলী হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মধ্য শা'বান এলে তোমরা তার রাত্রিতে ইবাদত কর এবং দিনে রোযা রাখ। কেননা, মহান আল্লাহ ঐ দিনের সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং বলেন, 'কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব। কেউ রুযীপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে রুযী দান করব। কেউ অসুস্থ আছে কি? আমি তাকে সুস্থ করব। কোন প্রার্থনাকারী আছে কি? আমি তাকে (যা চাইবে তা) দান করব। কেউ এমন আছে কি? কেউ তেমন আছে কি?---' এইভাবে ফজর পর্যন্ত বলতে থাকেন।"

কিন্তু হাদীসটি দলীলযোগ্য ও সহীহ নয়। বরং হাদীসটি মাওযূ' বা জাল হাদীস। *(দেখুন ঃ যয়ীফ ইবনে মাজাহ ২৯৪নং, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২১৩২নং, যয়ীফুল জামে' ৬৫২নং)*

তদনুরূপ উক্ত বিষয়ক অন্য হাদীসগুলিও যয়ীফ। পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহর নীচের আসমানে নামার কথা; কেবল ১৫ শা'বানের রাত্রের কথাই নয়।

হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

"আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।" *(বুখারী, মুসলিম, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১২২৩নং)*

সুতরাং অর্ধ শা'বানের রাত্রের কোন পৃথক বৈশিষ্ট্য থাকছে না। যেমন ঐ দিনে মাগরেবের পর থেকে মহান আল্লাহর নীচের আসমানে নেমে আসার কথাও প্রমাণ হচ্ছে না। যেহেতু তা মিথ্যা ও বানাওয়াটি কথা।

তৃতীয় অমূলক ধারণা ঃ রূহের আগমন

শবেবরাতে নাকি মৃত মানুষের রূহগুলো আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিলিত হতে পৃথিবীতে নেমে আসে। বিধবাদের স্বামীদের রূহও নাকি এই রাতে ঘরে ফেরে। তাই বিধবারা সাজ-সজ্জা করে নানা খাবার তৈরী রেখে ঘরে আলো জ্বেলে সারারাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে!

এ ব্যাপারে তাদের দলীল হল, সূরা লায়লাতুল ক্বাদরের নিম্নের আয়াত ঃ-

﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾

অর্থাৎ, উক্ত রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফিরিশ্তাকুল এবং রূহ তাঁদের প্রতিপালকের আদেশে অবতীর্ণ হন। *(সূরা ক্বাদর ৪ আয়াত)*

কিন্তু যাঁরা কুরআনের বাংলা তর্জমাও পড়তে পারেন, তাঁদেরও বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, ঐ রাত হল রমযান মাসের শবেকদরের রাত। যে রাতের নামে সূরাটির নামকরণ হয়েছে 'সূরা লায়লাতুল ক্বাদ্র।' তাহলে শবেকদরের ঘটনাকে শবেবরাতে জুড়ে দেওয়া কি মূর্খামি নয়?

তাছাড়া 'রূহ' বলতে মৃত ব্যক্তির আত্মা উদ্দেশ্য নয়। তা হলে তো বহুবচন শব্দ 'আরওয়াহ' ব্যবহার হত। এখানে 'রূহ' বলতে ফিরিশ্তা-সর্দার জিবরীল অথবা এক শ্রেণীর ফিরিশ্তাকে বুঝানো হয়েছে। *(তাফসীর ইবনে কাষীর ৪/৫৬৮)*

পক্ষান্তরে বিদিত যে, মানুষ মরণের পর মধ্য জগৎ 'বারযাখ'এ ভালো হলে ইল্লীয়্যীনে এবং মন্দ হলে সিজ্জীনে অবস্থান করে। সেখান হতে পুনরায়

দুনিয়ার বুকে ফিরে আসার কোন উপায় নেই। তবে বৃথা কেন এই আয়োজন ও প্রতীক্ষা?

রূহ ঘরে ফিরার অলীক ধারণা রেখেই ঘর ও কবরগুলোকে ধূপ-ধুনো ও মোমবাতি তথা বিদ্যুৎবাতি দিয়ে সুরভিত ও আলোকিত করা হয়। আর এ কাজে হিন্দুদের দেওয়ালীর অনুকরণ করে আমোদ-স্ফূর্তি করা হয়।

অথবা অনুকরণ হয় অগ্নিপূজকদের; যারা আগুনের তা'যীম ও পূজা করে। বলা বাহুল্য এটি হল, খলীফা হারুন রশীদের যুগে অগ্নিপূজক নও মুসলিম বারামক্বী মন্ত্রীদের আবিষ্কৃত বিদআত। এরাই বাদশা হারুন রশীদকে পরামর্শ দিয়েছিল, কা'বা-গৃহে সুগন্ধী (চন্দন কাঠ) জ্বালানোর জন্য। যাতে সেই সুবাদে মুসলিমদের মসজিদ-সমূহে তাদের প্রিয় মা'বূদ আগুন প্রবেশ করে যায়। *(দেখুন ঃ আল-ইবদা' ফী মাযা-র্রিল ইবতিদা' ২৮৯পৃঃ, মু'জামুল বিদা' ৩০০পৃঃ)*

সম্ভবতঃ রূহদেরকে স্বাগত জানাবার উদ্দেশ্যে ফটকা-বাজির ধুম ও সেই সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করা হয়!

অথচ আতশ বা ফটকাবাজী বৈধ নয়। কারণ, আগুন নিয়ে খেলা অবৈধ, এতে বিপদের আশঙ্কা অনেক, তাছাড়া লক্ষ-লক্ষ টাকা আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আর এতে অপব্যয় হয় অথচ উপকার কিছু হয় না। উল্টে লোককে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিরক্ত করে তোলে।

এ খেলা কোন সময়ই বৈধ নয়। বৈধ নয় বিবাহ বা ঈদেও।

আগত রূহদেরকে খাওয়াবার জন্য হালোয়া-রুটির বিরাট আয়োজন করা হয়। আদায় করা হয়, খাওয়া হয়, দান করা হয়। মওতাদের নামে অর্থ অথবা খাদ্য দান করা ভালো জিনিস। কিন্তু নির্দিষ্ট করে ঐ রাতে কেন? শরীয়তের কোন নির্দিষ্ট আমলকে অনির্দিষ্ট অথবা কোন অনির্দিষ্ট আমলকে স্থান, কাল বা সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট করাও তো এক শ্রেণীর বিদআত। তাছাড়া মুর্দার নামে নিজেদের উদরপূর্তি তথা আনন্দমেলাই হয় উদ্দেশ্য।

চতুর্থ অমূলক ধারণা ঃ কবর যিয়ারত

শা'বানের ১৫ তারীখের রাতে বা দিনে আত্মীয়রা দলেদলে কবর যিয়ারতে

ছুটে যায়, এমনকি মেয়েরাও বিভিন্ন রঙে-ঢঙে কবর যিয়ারতে বের হয়। অথচ বিদিত যে, নির্দিষ্ট করে ঈদের দিন বা শবেবরাতের দিন কবর যিয়ারত করা বিদআত। তাছাড়া কবরে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। সেখানে মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালানো হয়। আর এগুলিও বিদআত।

পক্ষান্তরে মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত বিধেয় নয়। কারণ, তাদের এমনিতেই ধৈর্য ও সহ্য শক্তি কম। তাছাড়া তারা শরীয়ত-বিরোধী কাজ অধিক করতে পারে যিয়ারতে গিয়ে। যেমন; চেঁচামেচি ও উচ্চস্বরে কান্না করবে, পর্দাহীনতার সাথে যিয়ারতে যাবে, অভ্যাসগতভাবে কবরস্থান বেড়াতে যাবে। (পার্ক মনে করে নেবে।) সেখানে বসে ফালতু আড্ডা দিয়ে বাজে কথাবার্তা বলবে। তাই তো পিয়ারা নবী ﷺ অধিক কবর যিয়ারতকারিনী মহিলাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। *(তিরমিযী ১০৫৬, ইবনে মাজাহ ১৫৭৪নং)*

বিদআতীরা অবশ্য যিয়ারত বিধেয় করার জন্য বলে, ঐ রাতে নবী ﷺ বাকী'তে কবর-যিয়ারতে গিয়েছিলেন। দলীল স্বরূপ উল্লেখ করা হয় যে, ঐ রাতে মা আয়েশা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে বাক্বীউল গারক্বাদ নামক গোরস্থানে পান। তিনি সেখানে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অর্ধ শা'বানের রাত্রে নিচের আসমানে নেমে আসেন এবং কলব গোত্রের ভেঁড়া-ছাগলের লোম সংখ্যক অপেক্ষা বেশী মানুষকে ক্ষমা করে দেন।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

কিন্তু হাদীসটি সহীহ নয়। *(দেখুন ঃ সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৪৪ নং, যয়ীফুল জামে' ১৭৬১নং, মিশকাত ১২৯৯নং)*

তাছাড়া মহানবী ﷺ বিশেষ করে কেবল অর্ধ শা'বানের রাতেই যিয়ারতে যেতেন না। বরং তিনি আয়েশার পালার প্রত্যেক রাতেই বাক্বীউল গারক্বাদের কবর যিয়ারতে যেতেন। *(এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস দেখুন ঃ আহমাদ ৬/১৮০, মুসলিম ৯৭৪, নাসাঈ ২০৩৯, ইবনে হিব্বান ৩১৭২, ৪৫২৩, বাইহাকী ১/৬৫৬, ৫/২৪৯, আবূ য়্যা'লা ৮/১৯৯, ২৪৯)*

পঞ্চম অমূলক ধারণা ঃ অস্বাভাবিক নামায

শবেবরাত আসলে শবেকদরের ভ্রান্ত রূপ। শবেকদরের আসল ছেড়ে শবেবরাতের নকল ইবাদত নিয়ে মাতামাতি করে ভাল বরাত বা ভাগ্য লাভের জন্য লোকে ১০০ রাকআত 'স্বালাতুল আলফিয়া' নামক নামায পড়ে থাকে। আর প্রত্যেক রাকআতে ১০ বার সূরা ইখলাস পড়ে থাকে। এ নামায মনগড়া বিদআত। *(মু'জামুল বিদা' ৩৪১-৩৪২পৃঃ)* শবেবরাতের নামায পড়লে নাকি ২০টি হজ্জের এবং ২০ বছর একটানা ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়! আর ১৫ তারীখে রোযা রাখলে নাকি অগ্র-পশ্চাৎ ২ বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়। এ সব কথা মিথ্যা ও খেয়ালী।

সুয়ূত্বী বলেন, 'এ নামাযের কোন ভিত্তি নেই।' *(আল-আমরু বিল-ইত্তিবা' ১৭৬পৃঃ, মু'জামুল বিদা' ৩৪২পৃঃ)*

এ রাতে নামায আদায়ের পূর্বে নাকি গোসলও করতে হয়। আর সে গোসলের সওয়াবও রয়েছে নাকি খেয়ালী; এ গোসলের প্রতি ফোঁটার পানির বিনিময়ে ৭০০ রাকআত নফল নামায আদায়ের সওয়াব আমল-নামায় লিখা হয়ে থাকে!!!

এ রাতে বালা দূর করা, আয়ু বৃদ্ধি করা এবং অভাবমুক্ত হওয়ার নিয়তে ৬ রাকআত বিদআতী নামায পড়া হয়। পড়া হয় সূরা ইয়াসীন সহ আরো মনগড়া দুআ। *(মু'জামুল বিদা' ৩৪২পৃঃ)*

এ ছাড়া আরো কত শত খেয়ালী ইবাদত ও সওয়াবের কথা পাওয়া যায় একাধিক বাজারী বই-পুস্তকে; যার সবগুলোই বিদআত এবং সে সবের একটিও সহীহ দলীল নেই।

বিদআতীদের কাছে ঐ নামাযের গুরুত্ব খুব বেশী। বেনামাযীরাও ঐ রাতে নামায পড়ে। অনেকে ফজরের আগে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ফলে ফজরের ফরয নামায গুল করে থাকে!

আতর-সুরমা লাগিয়ে ঐ রাত জেগে জামাতী যিক্র ইত্যাদি শুরু হয় শামের সুফীদের দ্বারা। বিশেষ করে মকহুল, খালেদ বিন মা'দান ও লুকমান বিন আমের প্রমুখ তাবেয়ীগণ ঐ রাত জেগে ইবাদত করলে, তাঁদের দেখাদেখি ঐ

আরো উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত হয়।

জাহেল বিদআতীদের অনেকেই বলে থাকে যে, ঐ দিনে বা রাতে আল্লাহর নবীর দান্দান-মুবারক শহীদ হলে নরম হালোয়া বানিয়ে খেয়েছিলেন। তাই ঐ দিনে তা বানানো, খাওয়া ও খাওয়ানো হল সুন্নত। অথচ ইসলামের ইতিহাসে সর্বজন বিদিত যে, মহানবী ﷺ-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল এক বারই; উহুদের যুদ্ধে। আর তা ঘটেছিল শওয়াল মাসের ১১ তারীখে; শাবান মাসে নয়। পরন্তু শওয়াল মাসেও তা পালন করা বিধেয় নয়।

তাছাড়া তাদের যদি সত্যপক্ষেই সুন্নতের প্রতি কোন মহব্বত থাকত, তাহলে জিহাদে দাঁত ভেঙ্গে হালোয়া খেত, ঘরে বসে আনন্দের সাথে নয়। আর মহানবী ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ করে শবেবরাত সহ সকল প্রকার সুন্নাহ-বিরোধী আচরণ ও পরব বর্জন করত।

সন্দেহ ও তার জবাব

বিদআতের কথা বলতে গেলে বিদআতীরা বলে, শবেবরাতের কাজগুলো তো ভাল? করলে ক্ষতি কি? ভালো কাজে বাধা দেন কেন?

কিন্তু জেনে রাখা উচিত যে, কাজ ভালো হলেই যে কোন সময় তা করা যাবে, তা নয়। কুরআন পড়া ভালো কাজ, কিন্তু যেখানে-সেখানে যখন-তখন পড়া অবশ্যই ভালো নয়। সিজদায় কুরআন পড়া বৈধই নয়। সূরা 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালো সূরা। ৩বার পড়লে ১বার কুরআন খতম করার সমান সওয়াব লাভ হয়। তা বলে তা পাঠ করে মুরগী যবাই করা হবে না। ইবাদত নিজের ইচ্ছামত নয়; বরং তরীকায়ে মুহাম্মাদী মত না হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪০নং)* "যে ব্যক্তি এমন আমল করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম ১৭১৮নং)* "আর নবরচিত কর্মসমূহ থেকে দূরে থেকো। কারণ, নবরচিত কর্ম হল বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(মুসনাদে*

নামায পড়ার ধুম শুরু হয়ে যায়। মদীনার আলেমগণ এর প্রতিবাদ করেন। *(দেখুনঃ লাতায়েফুল মাআরিফ, ইবনে রজব)*

আনুষ্ঠানিকভাবে এই নামাযের বিদআত চালু হয় ৪৪৮ হিজরীতে বাইতুল মাক্বদেসে। মূর্খ ইমামরা মাতব্বরি ও উদরপূর্তি করার জন্য এই ঘটা চালু করে। মনগড়া হাদীস বর্ণনার মাধ্যমে বেশী লোক জমা করে বাদশার কাছে নিজেদের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে। অতঃপর এই বিদআতী নামায সেখানে ৩৫২ বছর চলতে থাকে। পরে ৮০০ হিজরীতে তা বন্ধ হয়ে যায়। *(মিরকাত ২/১৭৮ মুল্লা আলী আল-ক্বারী)* কিন্তু ইরান-তুরান পার হয়ে সেই অগ্নিপূজকদের অগ্নিময় পরব ভারতের দেওয়ালী-মার্কা মুসলিমদের মাঝে চলে এল। সুতরাং তাতে সচেতন মুসলিমদের ধোকা খাওয়া উচিত নয়।

ষষ্ঠ অমূলক ধারণাঃ রোযা

১৫ শা'বানের দিনে রোযা রাখা হয়। তাদের দলীল হল, হযরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস; আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "মধ্য শা'বান এলে তোমরা তার রাত্রিতে ইবাদত কর এবং দিনে রোযা রাখ।---" অথচ এই হাদীস সহীহ নয়। *(দেখুন ঃ যয়ীফ ইবনে মাজাহ ২৯৪নং, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২১৩২নং, যয়ীফুল জামে' ৬৫২নং)* সহীহ নয় ঐ দিনে রোযা সংক্রান্ত কোন হাদীসই।

শবেবরাতের আনুষ্ঠানিকতা

বলাই বাহুল্য যে, অধিকাংশ পাল-পরবে অধিকাংশ মানুষেরই উদ্দেশ্য থাকে কিছু আনন্দ-আমোদ করা, সাধ্যমত ভালো পানাহার করা এবং সেই সাথে খুশীর পরিবেশ তৈরী করে সাজসজ্জার সাথে উৎসব উদ্‌যাপন করা। কুরআন খতম করে বখশানো হয়, মীলাদ ও মেহেমানদারির ধুম পড়ে যায়। ধুম পড়ে যায় নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশার। এর জন্যই সরকারীভাবে ঐ দিনটিকে ছুটি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। দেশের পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টিভিতে তার বিশেষ অনুষ্ঠান ও গুরুত্ব সম্প্রচার করা হয়। এক শ্রেণীর হুজুররা ঐ দিনের ভুয়ো ফযীলত বর্ণনা করে থাকেন। আর তাতে বিদআতীরা সেই সব বিদআতে

আহমদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত১৬৫নং) “আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই হল জাহান্নামে।” *(সহীহ নাসাঈ ১৪৮৭নং)*

অনেকে বলে, মেনে নিলাম শবেবরাত ও তার সকল আমল বিদআত। কিন্তু যেহেতু তাতে ইবাদতগত মঙ্গল রয়েছে, সেহেতু তাকে বিদআতে হাসানাহ বলা চলে। অতএব বিদআতে হাসানাহ করলে ক্ষতি কি?

কিন্তু জেনে রাখা ভালো যে, হাসানাহ (বা উৎকৃষ্ট) বলে কোন বিদআত নেই। বিদআতের সবটাই নিকৃষ্ট। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, “কুল্লু বিদআতিন য্বালালাহ, অর্থাৎ প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।” যেমন ভালো পায়খানা বলে কোন পায়খানা নেই। পায়খানাতে আতর লাগিয়ে গন্ধ দূর করতে পারলেও তার অপবিত্রতা কোথায় যাবে?

অনেকে বলে, ফাযায়েলে আমালে তো যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করা চলে? তবে তা ভিত্তি করে শবেবরাত পালন করলে ক্ষতি কি?

আমরা বলব যে, যেহেতু যয়ীফ হাদীস রসূল ﷺ-এর সঠিক উক্তি নাও হতে পারে, তাই যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে কোন আমল সিদ্ধ নয়। অবশ্য অনেকে ‘ফাযায়েলে আ’মালে’ যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ এমন আমলের ফযীলত বর্ণনায়, যে আমল সহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আ’মালুল ফাযায়েলে (অর্থাৎ এমন আমল যার ফযীলত আছে সেই আমল করতে) নয়।

উদাহরণস্বরূপ, চাশ্তের নামায সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। *(মুসলিম ৭১৯নং)* তার ফযীলত প্রসঙ্গে এক হাদীসে বলা হয়, “যে ব্যক্তি ঐ নামায পড়বে, তার গোনাহ সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও মাফ করা হবে।” *(আবূ দাঊদ ১২৮৭, তিরমিযী ৪৭৬, ইবনে মাজাহ ১৩৮২নং)* অন্য হাদীসে বলা হয়, “যে নিয়মিত ১২ রাকআত আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ পাক জান্নাতে এক সোনার মহল তৈরী করে দেবেন। *(তিরমিযী ৪৭৩, ইবনে মাজাহ ১৩৮০নং)* কিন্তু এই দুটি হাদীসই যয়ীফ। ওঁদের মতে চাশ্তের নামাযের ফযীলতে এই হাদীস দুটিকে বর্ণনা করা যাবে।

উপরন্তু এর উপরেও ওঁদের নিকট তিনটি শর্ত রয়েছেঃ-

প্রথমতঃ হাদীসটি যেন গড়া বা জাল না হয়। অথবা খুব বেশী দুর্বল না হয়।
দ্বিতীয়তঃ আমলকারীর যেন জানা থাকে যে, যে হাদীসের ভিত্তিতে সে আমল (ফযীলত বর্ণনা ও বিশ্বাস) করছে তা যয়ীফ বা দুর্বল।
তৃতীয়তঃ তা যেন (ব্যাপকভাবে) প্রচার না করা হয়।

শবেবরাতের ক্ষেত্রে সে সব শর্ত পাওয়া যায় না। শবেবরাতের আমল সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসই জাল অথবা খুব দুর্বল। তাছাড়া তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত এবং তার মূল ভিত্তিও কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না।

পরন্তু হাদীস ব্যবহারের ব্যাপারে আহকাম ও ফাযায়েলের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই । কারণ, উভয়ই শরীয়ত। তাই সঠিক এই যে, যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে কোন প্রকারের আমল সিদ্ধ নয়। সহীহ (ও হাসান) হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তাই আমলের জন্য যথেষ্ট।

অনেকে বলতে পারে, এত হাদীস যখন বর্ণিত আছে, তখন তার নিশ্চয় কোন ভিত্তি আছে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের রাত হওয়া সত্ত্বেও তা কোন সহীহ সূত্রে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হল না কেন? আর তার মানেই হল এর কোন বুনিয়াদই নেই।

এ রাতের ব্যাপারে যেটুকু সহীহ বলা হয়েছে, সেটুকু হল একদল সাহাবা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস; যাতে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “মহান আল্লাহ অর্ধ শা’বানের রাত্রে (নেমে এসে) নিজ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে মুশরিক ও বিদ্বেষপোষণকারী ছাড়া তাদের সকলকে ক্ষমা করে দেন।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৪৪নং)* কিন্তু তাতে কোন ইবাদত বা অনুষ্ঠান করার কথা প্রমাণ হয় না।

বলা হয় যে, শবেবরাতের দিনে মাহে রমযানের সিয়াম পালনের বিধান নাযিল হয়। এ কথাটি সহীহ দলীল সাপেক্ষ্য। শায়খ সাইয়্যেদ সাবেকের উল্লেখ অনুযায়ী সে বিধান নাযিল হয় সন ২ হিজরীর শা’বান মাসের ২য় তারীখ সোমবারে। *(ফিকহুস্ সুন্নাহ ১/৩৮৩ দ্রঃ)*

শুনতাম এবং আমার হাতে লাঠি থাকত, তাহলে আমি তাকে তা দিয়ে প্রহার করতাম।' *(আত্-তাহযীর মিনাল বিদা', ইবনে বায)*

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন, '---পক্ষান্তরে এককভাবে অর্ধ শা'বানের দিনে রোযা রাখার কোন ভিত্তি নেই। বরং এককভাবে ঐ দিনে রোযা রাখা মকরূহ। অনুরূপভাবে ঐ দিনকে এমন মৌসম (উৎসব) গণ্য করাও মকরূহ; যাতে নানা রকম খাদ্যসামগ্রী তৈরী করা হবে এবং তার জন্য সাজসজ্জা করা হবে। এ হল সেই নব আবিষ্কৃত (বিদআতী) মৌসম (উৎসব)সমূহের একটি, যার কোন ভিত্তি (শরীয়তে) নেই।--' *(ইকতিযাউস সিরাত্বিল মুস্তাক্বীম ৩০২-৩০৩পৃঃ)*

সঊদী আরবের প্রয়াত প্রধান মুফতী ইবনে বায (রঃ) বলেছেন, 'পূর্বে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস এবং আহলে ইলমের উক্তি থেকে সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, অর্ধ শা'বানের রাত্রিকে নামায বা অন্য কোন ইবাদত দ্বারা পালন করা এবং তার দিনে নির্দিষ্ট করে রোযা রাখা অধিকাংশ উলামার নিকট জঘন্যতম বিদআত। পবিত্র শরীয়তে তার কোন ভিত্তি নেই। বরং তা সাহাবা ﷺ গণের যুগের পর ইসলামে নবরূপে প্রকাশ লাভ করেছে।' *(আত্-তাহযীর মিনাল বিদা', ইবনে বায)*

শায়খ ইবনে উষাইমীন (রঃ) বলেন, '---অর্ধ শা'বানের রাত্রিতে আনন্দ-উৎসব করার কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই। তা করতে লোককে নিষেধ করা কর্তব্য। সেই উপলক্ষ্যে কাউকে দাওয়াত দেওয়া হলে, সে যেন (উৎসবে) উপস্থিত না হয়।' *(মাজমূউ ফাতাওয়া ২/২৯৬-২৯৭)*

তদনুরূপ ঐ দিনে কিবলা পরিবর্তন (?) বা আরো অন্য কিছু মাহাত্ম্যপূর্ণ কর্ম সংঘটিত হওয়া সত্য হলেও ঐ দিনকে শবেবরাত বা অন্য কোন নাম দিয়ে মর্যাদাসম্পন্ন দিনরূপে পালন করার যৌক্তিকতা কি থাকতে পারে?

শবেবরাত ও তার ইবাদত সম্পর্কে বড় বড় উলামায়ে কিরামের মন্তব্যঃ-

আবূ বাক্র ত্বুরত্বুশী (রঃ) (আল-হাওয়াদিষ গ্রন্থে) বলেন, 'ইবনে অয্যাহ যায়দ বিন আসলাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, আমরা দেখিনি যে, আমাদের কোনও শায়খ ও ফকীহ অর্ধ শা'বানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেছেন অথবা মাকহূলের হাদীসের প্রতি দৃক্পাত করেছেন। আর তাঁরা মনে করতেন না যে, অন্যান্য রাতের উপর ঐ (শবেবরাতের) রাতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব (বা ফযীলত) আছে।'

হাফেয ইরাকী (রঃ) বলেন, 'অর্ধ শা'বানের রাতের নামাযের হাদীস আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা।'

ইমাম নাওয়াবী (রঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-মাজমূ'তে বলেন, 'রজব মাসের প্রথম জুমআয় মাগরেব ও এশার মাঝে ১২ রাকআত 'সালাতুর রাগায়েব' নামে প্রসিদ্ধ নামায এবং অর্ধ শা'বানের রাতে প্রচলিত ১০০ রাকআত নামায; উভয় নামায দু'টিই জঘন্যতম বিদআত। কেউ যেন 'ক্বূতুল কুলূব' ও 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থদ্বয়ে উক্ত উভয় নামাযের উল্লেখ দেখে এবং তাতে উল্লেখিত হাদীস দেখে ধোকা না খায়। কারণ, তার প্রত্যেকটাই বাতিল। আর সেই সকল উলামার কথায়ও যেন কেউ ধোকা না খায়, যাঁদের নিকট উক্ত নামাযদ্বয়ের বিধান অস্পষ্ট থাকায় তা মুস্তাহাব বলে একাধিক পৃষ্ঠা (তার সমর্থনে) লিপিবদ্ধ করেছেন। অবশ্যই তাঁরা এ বিষয়ে ভ্রান্তিতে আছেন।'

ইবনুল মুলাইকাহকে বলা হয়েছিল যে, যিয়াদ নুমাইরী বলেন, 'অর্ধ শা'বানের রাত্রের ইবাদত এবং শবেকদরের ইবাদতের সওয়াব এক সমান।' এ কথা শুনে ইবনুল মুলাইকাহ বলেছিলেন, 'আমি যদি তার মুখ থেকে এ কথা বলতে

শা’বান মাসের অধিকাংশ দিনের রোযা

আল্লাহর রসূল ﷺ শা’বান মাসের অধিকাংশ দিনগুলিতে রোযা রাখতেন। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে রমযান ছাড়া অন্য কোন মাস সম্পূর্ণ রোযা রাখতে দেখি নি। আর শা’বান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসের অধিকাংশ দিনগুলিতে তাঁকে রোযা রাখতে দেখি নি।’ *(আহমাদ, বুখারী ১৯৬৯, মুসলিম ১১৫৬নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

হযরত উসামাহ বিন যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে শা’বান মাসে যত রোযা রাখতে দেখি তত অন্য কোন মাসে তো রাখতে দেখি না, (এর রহস্য কি)?’ উত্তরে তিনি বললেন, “এটা তো সেই মাস, যে মাস সম্বন্ধে মানুষ উদাসীন, যা হল রজব ও রমযানের মাঝে। আর এটা তো সেই মাস; যাতে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের নিকট আমলসমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার রোযা রাখা অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হোক। *(নাসাঈ, সহীহ তারগীব ১০০৮নং, তামামুল মিন্নাহ ৪১২পৃঃ)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট রোযা রাখার জন্য পছন্দনীয় মাস ছিল শা’বান। তিনি সে মাসের রোযাকে রমযানের সাথে মিলিত করতেন।’ *(সহীহ আবূ দাউদ ২১২৪নং)*

এখানে তাঁর শা’বানের অধিকাংশ দিনগুলিতে রোযা এবং এই মাসের রোযার সাথে রমযানের রোযাকে মিলিত করার হাদীসের সাথে রমযানের ২/১ দিন আগে রোযা রাখতে নিষেধকারী হাদীসের *(বুখারী ১৯১৪, মুসলিম ১০৮২নং)* অথবা তার কৃষ্ণপক্ষের দিনগুলিতে রোযা রাখতে নিষেধকারী হাদীসের *(সহীহ আবূ দাউদ ২০৪৯, সহীহ তিরমিযী ৫৯০নং)* কোন সংঘর্ষ বা পরস্পর-বিরোধিতা নেই। কেননা, উভয় শ্রেণীর হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব। আর তা এইভাবে যে, ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখা নিষিদ্ধ; যদি অভ্যাসগতভাবে কোন রোযা না পড়ে তাহলে। পক্ষান্তরে অভ্যাসগতভাবে ঐ দিনগুলিতে রোযা পড়লে রাখা

বৈধ। আর সেটাই ছিল মহানবী ﷺ-এর আমল। *(আহকামুস সাওমি অল-ই’তিকাফ ১৭৪পৃঃ)* অর্থাৎ, তিনি অভ্যাসগতভাবে ঐ দিনগুলিতে রোযা রাখতেন। এখতিয়ার করে নয়। যেমন প্রত্যেক মাসের (১৩-১৪-১৫) শুক্লপক্ষের শেষ ৩ দিন যারা রোযা রাখতে অভ্যাসী তাদের জন্য শা’বানের ১৫ তারীখে তৃতীয় রোযা রাখা দোষাবহ নয়।

অন্য দিকে এই মাসের ১৫ তারীখের রোযা রাখা এবং তাতে পৃথক কোন বৈশিষ্ট্য বা মাহাত্ম্য আছে মনে করা বিদআত; যেমন এ কথা পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। কেননা, এ ব্যাপারে বর্ণিত কোন হাদীস সহীহ নয়।

শবেকদরের বিশেষ নামায

বিশেষ করে ২৭শের রাত্রি জাগরণ করে জামাআতী যিক্র করা, নানা রকমের পানাহার সামগ্রী তৈরী বা ক্রয় করে পান-ভোজন করা, মিষ্টি বিতরণ করা ও (মাইকে আম) ওয়ায-মাহফিল করা বিদআত। *(মাজাল্লাতুদ দা’ওয়াহ ১৬৭৪/১৪ রমযান ১৪১৯হিঃ)*

প্রত্যেক শবেকদরের সারা রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করতে হয়, নামায পড়তে হয়। কিন্তু কেবল ২৭ তারীখের রাতে তারাবীহর পর খাস শবেকদরের নামায পড়ে বিদআতীরা। তাতে তারা প্রত্যেক রাকআতে সূরা ক্বাদ্র এত এত বার এবং সূরা ইখলাস এত এত বার পড়ে থাকে। শরীয়তে যার কোন দলীল ও ভিত্তি নেই। *(মু’জামুল বিদা’ ৩৪৫পৃঃ)*

জুমআতুল বিদা’

রমযানের শেষ জুমআহ (বিদায়ী জুমআহ) বিশেষ উদ্দীপনার সাথে পালন করার ভিত্তি শরীয়তে নেই। অতএব তা যে একটি বিদআত, সে কথা অনুমেয়।

ঈদুল ফিত্‌র

এ সম্পর্কে ‘রমযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল’ দ্রষ্টব্য।

ঈদুল আযহা

এ সম্পর্কে ‘যুল-হজ্জের তেরো দিন’ দ্রষ্টব্য।

গর্ভানুষ্ঠান

মহিলা যখন যাচিতভাবে প্রথম বারের মত গর্ভ হয়, তখন বাড়ির লোকেরা বিশেষ করে মায়ের বাড়ির লোকেরা শুনে খুব খুশী হয়। আবার সন্তান যদি বহু চাওয়া ও বহু চিকিৎসার পর হয়, তাহলে আরো আনন্দ আরো সতর্কতা থাকে সেই অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে কেন্দ্র করে।

কেউ বলে, সন্ধ্যাবেলায় ঘর থেকে বের হওয়া মানা। কেউ বলে, বাঁঝা মেয়ের কাছ ঘেঁসলে সন্তানের ক্ষতি হবে। কেউ বলে, অমুক জায়গার ধুলো ব্যবহার কর। কেউ বলে, অমুকের কাছ থেকে তাবীয নিয়ে ব্যবহার কর। কেউ বলে, সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় ঘরের ভিতর শুয়ে থাকতে হবে। ঐ সময় কাপড় নিচড়া হবে না, কিছু কাটা যাবে না। আরো কত বিদআতী কথা বলে ও কাজ করে বিদআতী ঘরের মেয়েরা।

গর্ভবতীকে গর্ভের পঞ্চম মাসে পাঁচভাজা খাওয়ানোর উৎসব পালন করে অনেকে। যেমন সপ্তম মাসে পালন করা হয় সাত রকম তরকারী দিয়ে ‘সাতভাত’ খাওয়ানোর অনুষ্ঠান। এই সময় উপহার নেওয়া-দেওয়া নিয়েও মনোমালিন্য ঘটে বিয়াই বাড়ির সাথে। যেমন ‘পোত’, তার সামগ্রী ও পরিমাণ নিয়ে নানা গঞ্জনা-ভর্ৎসনা তথা কলহ বাধতে দেখা যায় বহু সংসারে।

এগুলি দেশাচার, স্ত্রী-আচার বা লোকাচারের নামে করা হলেও তাতে রয়েছে কুসংস্কার ও কুপ্রথা এবং বিজাতির সাধভক্ষণ (গর্ভিণীর স্পৃহানুযায়ী খাদ্যাদি

ভোজনোৎসব)এর অনুকরণ। আর তার সাথে রয়েছে সামাজিক অপকারও। অতএব বিজাতির অনুকরণ না করে মুসলিমদেরকে এই শ্রেণীর কুপ্রথা বর্জন করে কুসংস্কারমুক্ত মুসলিম হতে হবে। তবেই পাবে ইহ-পরকালে শান্তির রাজ্য।

দু’কুড়ি দিন

(পবিত্রতার প্রসূতি-আচার)

প্রসবের ২/১ দিন পূর্ব থেকে বা প্রসবের পর থেকেই লাগাতার ক্ষরণীয় খুনকে নিফাসের খুন বলে। এই খুন সর্বাধিক ৪০ দিন ঝরতে থাকে এবং এটাই তার সর্বশেষ সময়। সুতরাং ৪০ দিন পর খুন দেখা দিলেও মহিলা গোসল করে নামায-রোযা করবে। অবশ্য ৪০ দিনের মাথায় যদি প্রসূতির মাসিক আসার সময় হয় এবং খুন একটানা থেকে যায় তবে তার অভ্যাসমত মাসিককালও অপেক্ষা করে তার পর গোসল করবে।

৪০ দিন পূর্বে এই খুন বন্ধ হলেও গোসল সেরে নামায-রোযা করতে হবে। স্বামী সহবাসও বৈধ হবে। কিন্তু ২/৫ দিন বন্ধ হয়ে পুনরায় (৪০ দিনের পূর্বেই) খুন এলে নামায-রোযা ইত্যাদি বন্ধ করবে এবং পরে যখন বন্ধ হবে অথবা ৪০ দিন পূর্ণ হলে গোসল করে পাক হয়ে যাবে। মাঝের ঐ দিনের নামায-রোযা শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং স্বামী সঙ্গমেরও পাপ হবে না।

এই হল প্রসবের পর পবিত্রতার বিধান। বলা বাহুল্য, ৪০তম দিনকেই পবিত্রতার জন্য নির্দিষ্ট করা এবং সেই দিনেই গোসলাদি করে পাক-পবিত্রা হওয়া তথা আগে খুন বন্ধ হলেও গোসল করে পাক না হওয়া বিরাট ভুল।

মহিলাদের কৃত বিশেষ আচারের ঐ দিনকে ‘দু’কুড়ি দিন’ বলে। যদিও নিয়মিত গোসল করা এবং অপবিত্র কাপড় পবিত্র করা ছাড়া আর অন্য কোন স্ত্রী-আচার ঐ দিনে নেই, তবুও বিভিন্ন আচার বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে প্রচলিত দেখা যায়। যেমন ঐ দিনে বাড়ির লোকের সকলের কাপড় ধোয়া,

গুনতি করে মোমবাতি জ্বালিয়ে তা ফুঁ দিয়ে নিভানো অতঃপর কেক কেটে খাওয়া প্রভৃতি বিধর্মীয় প্রথা; মুসলিমদের জন্য তা বৈধ নয়। বৈধ নয় ঐ উপলক্ষ্যে পাওয়া দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা। বৈধ নয় সে উপলক্ষ্যে ঐ শিশুকে দুআ, মুবারকবাদ ও উপহার দেওয়া। যেহেতু ইবাদতের মতই যে কোনও ঈদ শরীয়তের দলীল-সাপেক্ষ। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/৮৭, ১১৫, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৩০২)*

নিঃসন্দেহে এটি একটি সুন্নত; ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সুন্নত। ইসলাম ও নবীর সুন্নত বর্জন করে বিজাতির সুন্নত অবলম্বন করা মুসলমানদের জন্য বড়ই ধিক্কার ও ন্যাক্কারজনক।

প্রিয় নবী সত্যই বলেছেন, “অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির সুন্নত অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি গো-সাপের (সান্ডা)র গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে সঙ্গম করে, তাহলে তোমরাও তা করবে!)” সাহাবাগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইয়াহুদ ও নাসারার অনুকরণ করার কথা বলছেন?’ তিনি বললেন, “তবে আবার কার?” *(বুখারী, মুসলিম ২৬৬৯, হাকেম, আহমাদ, সহীহুল জামে’ ৫০৬৭ নং)*

তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি যে জাতির আনুরূপ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।” *(আহমাদ ২/৫০, আবূ দাউদ ৪০৩১, সহীহুল জামে’ ৬০২৫ নং)*

তিনি আরো বলেন, “সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তোমরা ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না, আর খ্রীষ্টানদেরও সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।” *(তিরমিযী ২৬৯৫নং, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪নং)*

তাছাড়া জন্মদিনে খুশী ও উৎসব করা নেহাতই বোকামী। জীবন থেকে একটি বছর ঝরে গেলে তার জন্য আক্ষেপ ও দুঃখ করা উচিত, খুশী নয়।

লৌকিকতার সাথে উপহার-সামগ্রীর আশা। আশা ভঙ্গ হলে নানা
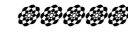
শিশুকে কোলে রেখে মায়ের ৫ ধরনের খাবার খাওয়া; যাতে ছেলে পেটুক না হয়, আঁতুড়-ঘরকে কেন্দ্র করে নানা আচার ইত্যাদি।

মহিলাদের উচিত, ইসলামী সহীহ শিক্ষার উপর আমল করা এবং মনগড়া রচিত সকল আচার-আচরণ বর্জন করা। অভিভাবকদের উচিত, তাদেরকে সঠিক শিক্ষা দেওয়া এবং দেশাচার মনে করে তাদের কৃত বিদআত ও কুসংস্কারে চুপ না থাকা।

মুখে ভাত

অন্নপ্রাশনের অনুকরণে বহু নামধারী মুসলিম পরিবারও নিজেদের ছেলে-মেয়েদের মুখে প্রথম ভাত দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠান করে থাকে। আয়োজন থাকে নানা খান-পানের। নির্দিষ্ট আচার পালন করে উপস্থিত সকলে একে একে শিশুর মুখে প্রথম ভাত তুলে দেয় এবং সেই সাথে উপহার পেশ করে থাকে। উপহার ছোট বা কম দামের হলে দাতার সমালোচনা করা হয়।

এই অবসরে অনেকে প্রচলিত মীলাদও পড়িয়ে থাকে।

সচেতন মুসলিম মাত্রই বুঝতে পারবেন যে, এটি বিজাতির অনুকরণে একটি জঘন্য বিদআত।

আকীকা

এ ব্যাপারে ‘শিশু-প্রতিপালন’ দ্রষ্টব্য।

জন্মদিন

শিশুর জন্মদিন (হ্যাপি বার্থ ডে’) পালন করা এবং সেই দিনে আত্মীয়-বন্ধু জমায়েত হয়ে কোন উৎসব ও অনুষ্ঠান সহ খুশী উদ্‌যাপন করা, সেদিনে শিশু (বা বুড়ো)কে বিশেষ দুআ, সালাম বা উপহার পেশ করা, বয়স অনুসারে বছর

সমালোচনা।

তদনুরূপ বৈধ নয় বড় বড় ব্যক্তিত্বের জন্মবার্ষিকী অথবা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা। প্রথমতঃ আমাদের শরীয়তে তা পালন করার বিধান নেই। ইসলামে কত লক্ষ লক্ষ আম্বিয়া, সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে'-তাবেয়ীন, আয়িম্মা, মুহাদ্দেসীন, মুফাসসেরীন, আওলিয়া, শায়খুল ইসলাম, শায়খুল হাদীস, রাজা-বাদশা ও কবি-সাহিত্যিকদের জন্ম-মৃত্যু ঘটেছে। কৈ তাঁদের কারো জন্ম অথবা মৃত্যু দিবস পালন করা হয়নি সলফদের যুগে।

আর দ্বিতীয়তঃ তা পালন করতে হলে প্রায় প্রত্যহ কারো না কারো জন্মদিন পালন করে আনন্দ অথবা কারো না কারো মৃত্যুদিন পালন করে শোক অথবা একই দিনে আনন্দ ও শোক এবং হাসি ও কান্না উভয়ই প্রকাশ করতে হবে। আর সেই সাথে বছরের প্রায় সকল দিনগুলিতে সরকারী ছুটি ঘোষণা করে কাজ বন্ধ করে সমাজকে পঙ্গুত্বের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে।

অতএব মহান ব্যক্তিবর্গের মহান চরিত্র ও কর্মাবলী নিয়ে আমরা তাঁদেরকে স্মরণ করব। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁদের মহান স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগরিত রাখব আমাদের চরিত্র ও কর্মের মাধ্যমেই। আর তাঁদের স্মৃতিকে কেবল আনুষ্ঠানিকতার বেড়াজালে জড়িয়ে রাখব না। এই সংকল্পই হওয়া উচিত প্রত্যেকটি কর্মপ্রিয় খাঁটি মুসলিমের।

মরা বাড়ির ভোজ

মরা-বাড়ির তরফ হতে সাধারণভাবে গ্রাম ও আত্মীয়-স্বজনকে (অলীমার মত) দাওয়াত দেওয়া এবং আত্মীয়দের সেই দাওয়াত গ্রহণ করা বিধেয় নয়। বরং তা বড় বিদআত। *(মু'জামুল বিদা ১৬৩পৃঃ)* বিধেয় হল কোন আত্মীয় অথবা প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে মড়া-বাড়ির লোকেদের জন্যই পেট ভরার মত খানা-পিনা প্রস্তুত করে পাঠানো।

আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বলেন, জা'ফর ﷺ শহীদ হওয়ার পর যখন তাঁর সে

খবর পৌঁছল, তখন নবী ﷺ বললেন, "জা'ফরের পরিজনের জন্য তোমরা খানা প্রস্তুত কর। কারণ, ওদের নিকট এমন খবর পৌঁছেছে; যা ওদেরকে বিভোর করে রাখবে।" *(আবূ দাউদ ৩১৩২নং, তিরমিযী ৯৯৮নং, ইবনে মাজাহ ১৬১০নংপ্রমুখ, সহীহ আবূ দাউদ ২৫৮৬নং)*

সাহাবী জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী বলেন, 'দাফনের পর মড়া বাড়িতে খানা ও ভোজের আয়োজনকে এবং লোকদের জমায়েতকে আমরা জাহেলিয়াতের মাতম হিসাবে গণ্য করতাম। (যা ইসলামে হারাম।) *(আহমাদ ৬৯০৫নং, ইবনে মাজাহ ১৬১২নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৮নং)*

কিন্তু যে সমাজে সে সহানুভুতি ও সহায়তা নেই, সেখানে কি হবে? বদনাম নেওয়া ভালো হবে, নাকি জাহেলিয়াতি কর্ম?

পক্ষান্তরে খাবারের ব্যবস্থা না হলে নিজেদের তথা দূরবর্তী মেহেমানদের (যাদের সেদিন বাড়ি ফিরা অসম্ভব তাদের) জন্য তো নাচারে ডালভাত করতেই হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সুনামের লোভে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাছ-মাংসের ভোজবাজিতে আত্মীয় স্বজন, জানাযার কর্মী (?!) মাদ্রাসার স্টাফ ও ছাত্রবৃন্দ (!) পাড়া-প্রতিবেশী এবং কখনো বা গোটা গ্রামকে সাদরে নিমন্ত্রণ করা হয় ও তা পরমানন্দে খাওয়াও হয়, তথা কিছুতে একটু লবণ কম হলে দুর্নাম করতেও কসুর হয় না। এমন ভোজবাজি যে জাহেলিয়াত থেকেও নিকৃষ্টতর তাতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে কি?

মুসনাদে আহমাদের (৫/২৯৩) এক হাদীসে আছে যে, একদা মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাবর্গ এক জানাযার কাজ সেরে ফিরে এলে কুরাইশের এক মহিলা তাঁদেরকে একটি ছাগল যবাই করে দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ঘটনার সাথে মরা বাড়িতে ভোজ করার বা খাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। যেহেতু সে মহিলা ঐ মৃতব্যক্তির কেউ ছিল না। বরং ঐ সময় দাওয়াত হয়েছিল বলে হাদীসে তার উল্লেখ এসেছে। সুতরাং উক্ত হাদীস থেকে পেটপূজারীদের দলীল গ্রহণ করা বা একপাত খাওয়ার জন্য ঐ হাদীসকে দলীল স্বরূপ পেশ করা সত্যই হাস্যকর।

চাহারম

মৃতব্যক্তির যে স্থানে দম যায় সেই স্থানে কয়েকদিন ধরে রূহ ঘোরাফিরা বা যাতায়াত করে এমন ধারণা ভ্রান্ত ও বিদআত। কিন্তু সেই অলীক ধারণা মতে সে স্থানে কয়েকদিন যাবৎ লাতা দেওয়া, বাতি জ্বালানো, ধূপধুনো দেওয়া এবং মৃত্যুর চতুর্থ দিনে অথবা আগাপিছা কোন দিনে ঘটা করে হুযুর ডেকে মীলাদ পড়ে গোশ্ত-ভাত বা মিষ্টি-মিঠাই বিতরণ করে রূহ তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় অনেক বাড়িতে। এই আচার ও অনুষ্ঠান 'চাহারম' নামে পরিচিত।

বিদআতের সংজ্ঞার্থ যারা জানেন, তাঁরা জানেন যে, এ অনুষ্ঠানও বিদআত। যেহেতু এটি অমূলক ধারণাবশতঃ কৃত এমন একটি আচার, যার কোন প্রকার সমর্থন শরীয়তে মিলে না।

চালশে (চেহলম)

কোন আত্মীয়র মৃত্যুর চল্লিশতম দিনে তার নামে ভোজ-অনুষ্ঠান, মীলাদ-পাঠ বা দুআ-মজলিস করা ইসলামী শরীয়তে নেই। তাই ইসলামের নামে এ সব করা বিদআত।

আসলে এ প্রথাও কিন্তু বিজাতীয় প্রথা। (আমেরিকার) ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা অনুরূপ প্রথা ঐ দিনেই পালন করে থাকে। যেমন পুরনো যুগে মিসরীয় কাফেররা উক্ত প্রথা পালন করত।

বলাই বাহুল্য যে, মৃতব্যক্তির আত্মার কল্যাণের জন্য তার মৃত্যুর দিন অথবা এক সপ্তাহ পর অথবা ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ কিংবা চল্লিশ দিন অথবা বছর পার হলে কোন প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা বিদআত। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/১২০-১২১)*

বলাই বাহুল্য যে, মুরগী যবাই করে হুজুর ডেকে মীলাদ পড়িয়ে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে দুআ করে অথবা বিরাট ভোজ-অনুষ্ঠান করে কোন লাভ

মৃত্যু-বার্ষিকী

কেউ মারা গেলে তাঁর ব্যক্তিত্ব যত বড়ই হোক, তাঁর স্মরণে প্রত্যেক বছর তাঁর মৃত্যু-তারীখে কোন স্মরণ-সভা, শোক-দিবস, দুআ-মজলিস, মীলাদ-মাহফিল, ঈসালে-সওয়াব, উরস-উৎসব, মৃত্যু-বার্ষিকী, ভোজ-আয়োজন ইত্যাদি বিদআত।

ঈসালে সওয়াব করতে হলে শরীয়ত-সম্মত পন্থাতেই করতে হবে। নচেৎ সওয়াব ঈসাল হবে না।

কারো স্মরণ তাজা করতে হলে তাতে লাভ-নোকসান খতিয়ে দেখতে হবে এবং শরীয়তের অনুমোদন থাকতে হবে। নচেৎ হিতে বিপরীত হলে ফল কি?

মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করা বৈধ হলে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মৃত্যু তারীখে তা পালন করা বিধেয় হত এবং তিনি খোদ সাহাবা ؓ-কে এ বিষয়ে কোন না কোন নির্দেশ বা ইঙ্গিত দিয়ে যেতেন। পক্ষান্তরে আমরা যদি বুযুর্গদের জন্ম ও মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করি, তাহলে বছরের প্রায় প্রত্যেকটি দিন এক একটি পরবে পরিণত হয়ে যাবে। আর বর্তমান প্রথায় তা পালন করতে করতে প্রায় প্রত্যেক দিনই হালোয়া-রুটি, মীলাদ-মাহফিল, শোক অথবা আনন্দ, ছুটি ও বন্ধ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ব। তাহলে তো কি আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে?

আমাদের কে স্মরণীয় বিষয় স্মরণ করতে হবে। বরণীয় ব্যক্তিবর্গের করণীয় আমাদের স্মরণীয় বিষয় হলে এবং তাই আমাদেরও করণীয় কর্তব্য হলে তবেই আমরা সফলকাম হতে পারব। নচেৎ তাঁদের নামে সিন্নী-মিঠাই বিতরণ করে, ধূপ-মোমবাতি জ্বেলে, ফুল চড়িয়ে, মীলাদ-মাহফিল বা অন্য কোন অনুষ্ঠান পালন করে আমাদের নোকসান ছাড়া কোন লাভ হবে না।

নেই। তাতে যদি সমাজের কাছে নাম নেওয়ার কিংবা বদনাম থেকে বাঁচার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তো মুর্দার কোন কল্যাণই হবে না।

হ্যাঁ, আপনি যদি আপনার পরলোকগত বাপ, মা বা অন্য কোন আত্মীয়র সত্যই কল্যাণ চান, তাহলে আপনি তাই করুন, যাতে সত্যই কল্যাণ আছে। আর যাতে কল্যাণ লাভ হবে তা জানতে আমাদেরকে শরীয়তের সাহায্য নিতে হবে।

আপনি আপনার আত্মীয়র জন্য দুআ করুন। বিশেষ করে ফরয নামাযের পশ্চাতে সালাম ফিরার আগে ও তাহাজ্জুদে তার জন্য দুআ করতে ভুল করবেন না। এক পাত ভাত বা দুটি মিঠায়ের বিনিময়ে ভাড়া করা লোকের দ্বারা দুআ করিয়ে আপনি কোন্ শ্রেণীর লাভের কথা আশা করেন। আপনার মা-বাপের জন্য আপনি নিজে দুআ করুন। আপনার মা-বাপের জন্য আপনার মত দরদ কি ওদের হতে পারে? আপনার মত আর কারো দুআতে কি সে আন্তরিকতার ভরসা করতে পারেন?

আর জেনে রাখুন যে, দুআ কবুলের সমস্ত শর্ত পূর্ণ থাকলে নিশ্চয় সে দুআ তার কাজে দেবে। কুরআন মাজীদে মৃতের জন্য দুআর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। *(সূরা হাশ্‌র ১০ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺও মৃতব্যক্তির জন্য দুআ করেছেন। যেমন, জানাযার নামায ও কবর যিয়ারতের বিভিন্ন দুআ এ কথার সাক্ষী। যার প্রায় সবটাই মাইয়্যেতের জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনায় পূর্ণ। পরন্তু মহানবী ﷺ এ কথাও বলেছেন, "মুসলিম ব্যক্তির কোন ভায়ের জন্য তার অদৃশ্যে থেকে দুআ কবুল হয়। দুআকারীর মাথার উপর এক ফিরিশ্তা নিয়োজিত থাকেন। যখনই দুআকারী তার (অদৃশ্য বা অনুপস্থিত) ভায়ের জন্য দুআ করে, তখনই উক্ত ফিরিশ্তা বলেন, 'আমীন। আর তোমার জন্যও অনুরূপ।" *(মুসলিম ২৭৩৩, আবু দাউদ ১৫৩৪নং প্রমুখ)*

আপনার আত্মীয়র আপনিই অভিভাবক বা ওয়ারেস হলে এবং সে নযর-মানা রোযা রেখে মারা গেলে আপনি তার তরফ থেকে কাযা রেখে দেন, তার

সওয়াব তার উপকারে আসবে।

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "ব্যক্তি রোযা কাযা রেখে মারা যায় সে ব্যক্তির তরফ থেকে তার অভিভাবক (বা ওয়ারেস) রোযা রাখবে।" *(বুখারী ১৯৫২, মুসলিম ১১৪৭নং, প্রমুখ)*

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, 'এক মহিলা সমুদ্র-সফরে বের হলে সে নযর মানল যে, যদি আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তাকে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ দান করেন, তাহলে সে একমাস রোযা রাখবে। অতঃপর সে সমুদ্র থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে এল। কিন্তু রোযা না রেখেই সে মারা গেল। তার এক কন্যা নবী ﷺ এর নিকট এসে সে ঘটনার উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "মনে কর, তার যদি কোন ঋণ বাকী থাকত, তাহলে তা তুমি পরিশোধ করতে কি না?" বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ অধিকরূপে পরিশোধ-যোগ্য। সুতরাং তুমি তোমার মায়ের তরফ থেকে রোযা কাযা করে দাও।" *(আবূ দাউদ ৩৩০৮নং, আহমাদ ২/২১৬ প্রমুখ)*

রমযানের রোযা কাযা রেখে মারা গেলে তার বিনিময়ে আপনি ফিদয়্যাহ (প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একটি মিসকীনকে একদিনের খাদ্য অথবা ১ কিলো ২৫০ গ্রাম করে চাল) দিন। তার সওয়াবও মাইয়্যেতের জন্য উপকারী।

আমরাহর মা রমযানের রোযা বাকী রেখে ইন্তিকাল করলে তিনি মা আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি আমার মায়ের তরফ থেকে কাযা করে দেব কি?' আয়েশা (রাঃ) বললেন, 'না। বরং তার তরফ থেকে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে এক একটি মিসকীনকে অর্ধ সা' (প্রায় ১কিলো ২৫০ গ্রাম খাদ্য) সদকাহ করে দাও।' *(ত্বাহাবী ৩/১৪২, মুহাল্লা ৭/৪, আহকামুল জানাইয, টীকা ১৭০পৃঃ)*

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, 'কোন ব্যক্তি রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে এবং তারপর রোযা না রাখা অবস্থায় মারা গেলে তার তরফ থেকে মিসকীন খাওয়াতে হবে; তার কাযা নেই। পক্ষান্তরে নযরের রোযা বাকী রেখে গেলে তার তরফ থেকে তার অভিভাবক (বা ওয়ারেস) রোযা রাখবে।' *(আবূ দাউদ ২৪০১নং প্রমুখ)*

আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন, "মানুষ সবচেয়ে হালাল বস্তু যেটা ভক্ষণ করে তা হল তার নিজ উপার্জিত খাদ্য। আর তার সন্তান হল তার নিজ উপার্জিত ধন স্বরূপ।" *(আবূ দাউদ ৩৫২৮, তিরমিযী ১৩৫৮, নাসাঈ ৪৪৬৪, ইবনে মাজাহ ২১৩৭নং প্রমুখ)*

তাই সন্তান যদি তার পিতা-মাতার নামে দান করে অথবা ক্রীতদাস মুক্ত করে অথবা হজ্জ করে, তাহলে এসবের সওয়াবে তারা উপকৃত হবে।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, সা'দ বিন উবাদাহর মা যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার অনুপস্থিত থাকা কালে আমার আম্মা মারা গেছেন। এখন যদি তাঁর তরফ থেকে কিছু দান করি তাহলে তিনি উপকৃত হবেন কি?' নবী ﷺ বললেন, "হ্যাঁ হবে।" সা'দ বললেন, 'তাহলে আমি আপনাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আমার মিখরাফের বাগান তাঁর নামে সদকাহ করলাম।' *(বুখারী ২৭৫৬নং প্রমুখ)*

আব্দুল্লাহ বিন আম্র বলেন, আস বিন ওয়াইল সাহমী তার তরফ হতে ১০০টি ক্রীতদাস মুক্ত করার অসিয়ত করে মারা যায়। সুতরাং তার ছোট ছেলে হিশাম ৫০টি দাস মুক্ত করে। অতঃপর তার বড় ছেলে আম্র বাকী ৫০টি দাস মুক্ত করার ইচ্ছা করলে বললেন, '(বাপ তো কাফের অবস্থায় মারা গেছে) তাই আমি এ কাজ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না করে করব না।' সুতরাং তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে ঘটনা খুলে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি বাকী ৫০টি দাস তার তরফ থেকে মুক্ত করব?' উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "সে যদি মুসলিম হতো এবং তোমরা তার তরফ থেকে দাস মুক্ত করতে, অথবা সদকাহ করতে অথবা হজ্জ করতে তাহলে তার সওয়াব তার নিকট পৌঁছত।" *(আবূ দাউদ ২৮৮৩নং, বাইহাকী ৬/ ২৭৯, আহমাদ ৬৭০৪নং)*

তবে হ্যাঁ, দান খয়রাত করার বা মিসকীন খাওয়ানোর জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন, ক্ষণ বা মজলিস করবেন না অথবা তাতে নাম নেওয়ার আশা পোষণ করবেন না। নচেৎ ভিক্ষার ঝুলিতে ভর্ৎসনাই পাবেন আল্লাহর কাছে। আপনার নাম হবে, কিন্তু আপনার আত্মীয়র কোন কাম হবে না। বলা বাহুল্য, উত্তম হল
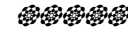
আপনার আত্মীয় যদি ঋণ পরিশোধ না করে মারা যায়, তাহলে আপনি তা আদায় করে দিন। তা করলে সে কবরে উপকৃত হবে। আর না করলে বেহেশ্তের পথে সে আটকে থাকবে।

আপনার আত্মীয় হজ্জ করার নযর মেনে মারা গেলে, অথবা হজ্জ ফরয হওয়ার পর কোন ওযরে না করে মারা গেলে আপনি (নিজের ফরয হজ্জ আগে পালন করে থাকলে) তার তরফ থেকে তা পালন করে দিন। এর সওয়াবেও সে লাভবান হবে।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমার বোন হজ্জ করার নযর মেনে মারা গেছে। (এখন কি করা যায়?) নবী ﷺ বললেন, "তার ঋণ বাকী থাকলে কি তুমি পরিশোধ করতে? লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করে দাও। কারণ, তা অধিক পরিশোধ-যোগ্য।" *(বুখারী ৬৬৯৯নং)*

অনুরূপ এক মহিলা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার আব্বা বড় বৃদ্ধ। তার ফরয হজ্জ বাকী আছে। এখন সওয়ারীতে বসে থাকতেও সে অক্ষম। আমি কি তার তরফ থেকে হজ্জ করে দেব?' নবী ﷺ বললেন, " 'হ্যাঁ।' করে দাও।" *(মুসলিম ১৩৩৪-১৩৩৫নং প্রমুখ)*

অবশ্য ফরয হওয়া সত্ত্বেও যে বিনা ওজরে সময়ের অবহেলা করে হজ্জ না করে মারা গেছে তার তরফ থেকে হজ্জ আদায় কোন কাজে দেবে না। *(আহকামুল জানাইয ১৭১পৃঃ, টীকা)*

আপনি বেশী বেশী নেক কাজ করুন, তাহলে আপনার মৃত পিতামাতাও উপকৃত হবেন। কারণ, মাইয়্যেতের ছেড়ে যাওয়া নেক সন্তান যে নেক আমল করে তার সওয়াবের অনুরূপ সওয়াব লাভ হয় তার পিতা-মাতারও। এতে সন্তানের সওয়াবও মোটেই কম হয় না। কারণ, সন্তান হল পিতা-মাতার আমলকৃত ও উপার্জিত ধনের ন্যায়। আর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾

অর্থাৎ, এবং মানুষ তাই পায়; যা সে করে। *(সূরা নাজ্‌ম ৩৯ আয়াত)*

গোপনে দান করা। যাতে আপনি মনের ঐ প্রশংসা-বাসনা থেকে দূরে থাকতে পারেন।

এ ছাড়া মাইয়্যেতের ছেড়ে যাওয়া স্বকৃত প্রবাহমান ইষ্টাপূর্ত কীর্তিকর্ম (সাদকায়ে জারিয়াহ); যেমন, মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, কল-কুঁয়া প্রভৃতি তৈরী, উপকারী গ্রন্থ প্রণয়ন প্রভৃতি; যে সব কীর্তির উপকারিতা দীর্ঘস্থায়ী বহমান থাকে- সে ধরনের নিজের কর্মফল মৃত মধ্যজগতেও ভোগ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَٰرَهُمْۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِيٓ إِمَامٖ مُّبِينٖ ﴾

অর্থাৎ, আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি ওদের কৃতকর্ম আর যে কীর্তিসমূহ পশ্চাতে রেখে যায়। আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট গ্রন্থে সংরক্ষিত রেখেছি। *(সূরা ইয়াসীন ১২আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মানুষ মারা গেলে তিনটি জিনিস ছাড়া তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; সদকাহ জারিয়াহ, ফলপ্রসূ ইল্‌ম (শিক্ষা) এবং নেক সন্তান; যে তার জন্য দুআ করে।" *(মুসলিম ১৬৩১, আবূ দাঊদ ২৮৮০, নাসাঈ ৩৬৫৩নং প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেন, "মরণের পরেও মুমিনের যে আমল ও নেকী তার সাথে মিলিত হয় তা হল; এমন ইল্‌ম যা সে শিক্ষা করেছে এবং প্রচার করেছে, তার ছেড়ে যাওয়া নেক সন্তানও মুসহাফ (কুরআন শরীফ), তার নির্মিত মসজিদ ও মুসাফির খানা, তার খননকৃত নালা বা ক্যানেল এবং তার মালের সদকাহ যা সে তার সুস্থ ও জীবিত থাকা অবস্থায় দান করে গেছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২নং)*

এ কথা স্পষ্ট যে, নিজের হাতে করে যাওয়া নেকীতেই লাভের আশা করা যায়। তাছাড়া অপরে যে ঠিকমত ঈসালে সওয়াব করবে তার ভরসা কোথায়?

পক্ষান্তরে শরীয়তের অনুমোদিত ছাড়া অন্যান্য আমল বা পদ্ধতি দ্বারা ঈসালে সওয়াব করলে তা বেসরকারী ডাকে ইরসাল হবে যা সঠিক ঠিকানায় পৌঁছবে না। সুতরাং মাইয়্যেতের তরফ থেকে তওবা করা, নামায পড়া, নিজের

অথবা ভাড়াটে ক্বারীদের কুরআনখানী, ফাতিহাখানী, কুলখানী, শবীনা পাঠ, চালশে, চাহারম, নিয়মিত বাৎসরিক দুআ মজলিস ইত্যাদি কোন মতেই ঈসাল বা 'রিসিভড্‌' হবে না। *(আহকামুল জানাইয, মু'জামুল বিদা' ১৩৫পৃঃ)*

পরিশেষে জেনে রাখা উচিত যে, নাস্তিক, কাফের, মুশরিক, মুনাফিক ও বেনামাযী, যারা কবরের আযাব ও জান্নাত-জাহান্নাম কিছুই বিশ্বাস করে না, তাদের নামে যদি কোন শরীয়তসম্মত ঈসালে সওয়াব করা হয়, তাহলেও তা তাদের কোন কাজে আসবে না। সুতরাং বিদআতী ঈসালে সওয়াব, কুরআন-খতম, ফাতিহাখানী, কুলখানী, চালশে, চাহারম, দুআ মজলিস, মীলাদ-মাহফিল, ভোজ অনুষ্ঠান ইত্যাদি তাদের কোন্‌ কাজে আসতে পারে? যাদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ছিল না, তাদের নামে ধর্মব্যবসায়ীদের নকল ধর্মের ধর্মীয় আচার কেন? যাদের পরকালে বিশ্বাস নেই, তাদের পারলৌকিক কল্যাণ বা মুক্তির জন্য এ লৌকিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা কেন? এ সব আচার পালনের মাধ্যমে কেবল ছেলেদের বদনাম থেকে বাঁচার, অথবা নাম নেওয়ার, অথবা সামাজিক ও প্রথাগত কর্তব্যভার হাল্কা করার, অথবা ভোট নেওয়ার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে না তো?

ফাতেহা ও কুল খানী

কোন প্রিয়জনের নামে, তার আত্মার কল্যাণের জন্য, তার পরকালে মুক্তি লাভের আশায় মরণের ৩ দিন পর অথবা অন্য কোন দিনে বহু লোকে হুযুর, মুন্সী, উস্তাযী, তালেবে ইল্‌ম বা মুসল্লী দাওয়াত দিয়ে ঘরে এনে অথবা মসজিদ-মাদ্রাসায় ৭০ হাজার বার কালেমা ত্বাইয়েবা পাঠ বা ফাতিহাখানী অথবা কুলখানী করিয়ে মৃতের নামে ঈসালে সওয়াব করা হয়।। নির্দিষ্ট পরিমাণে বুট বা ছোলা দিয়ে একবার পড়া হলে একটি করে ছোলা সরিয়ে রাখা হয়। সবশেষে থাকে মুনাজাত ও খানপানের ব্যবস্থা।

ঈসালে সওয়াবের এমন পদ্ধতি যেহেতু মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের যুগে

ছিল না, সেহেতু তা বিদআত বিধায় তা বর্জনীয়।

শবীনা ও কুরআনখানী

বহু মুসলমানই বর্কত ও সওয়াবের আশায় এক রাত্রি ব্যাপী কুরআন খতমের মজলিস অনুষ্ঠিত করে থাকে। হাফেয ভাড়া করা হয় অথবা হুজুররা দেখে দেখেই খতম করে থাকেন। কোন কোন মজলিসে এক এক হাফেয বা মৌলবী সাহেবকে কুরআন মাজীদের অংশ ভাগ করে তা পাঠ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কেউ কেউ মাঝে-ফাঁকে বাদ দিয়ে নিজের ভাগ শেষ করে থাকেন।

মাইকযোগে সারা সারা রাত ঝড়ের গতিতে কুরআনখানী চলে। কয়জন আল্লাহর বান্দাই বা তা যথোচিত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে? অতিরিক্ত শব্দে বহু মানুষের কাছে কুরআন অবহেলিত হয়। ডিষ্টার্ব হয় কত মানুষের। ছাত্র-ছাত্রীর লেখা-পড়ায় ব্যাঘাত ঘটে, রোগ-পীড়িত মানুষের মনে আঘাত লাগে, আরাম ও ঘুম জরুরী এমন মানুষের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করে, বাড়ির নিভৃত কোণেও দম্পতির প্রেমালাপ ও দৈহিক মিলনের সময় উপেক্ষিত হয় আল্লাহর কুরআন। অমুসলিমদের মনে সৃষ্টি করে বিতৃষ্ণা। সত্যই তো যে বাণী বুঝাই যায় না, সে বাণীর প্রতি কর্ণপাত করবে কয়জন?

খতম শেষে হাত তুলে জামাআতী দুআ হয়। খান-পানের ধুমও থাকে বেশ জোরদার। এতে যা খরচ হয়, তা নেহাত কম নয়। কিন্তু এ সব তো করা হয় কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। তবে হয়তো বা খতমদাতা জানে না যে, সত্যপক্ষে এ কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই। যেহেতু এ কাজ তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী হয় না তাই।

ভাড়াটিয়া হাফেয-হুজুরদের এ কুরআনখানীতে কোন সওয়াবও নেই; না তাঁদের, আর না-ই খতমদাতার। কারণ, তাঁরা পড়েন কিছু কামায়ের জন্য।

আর খতমদাতার সওয়াব হয় না, যেহেতু তা বিদআত। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৩০৪)*

যে হাফেয বা হুজুরদেরকে নিয়ে খতম পড়ানো হয়, কৈ তাঁরা তো কোনদিন ঐ শ্রেণীর খতম পড়ান না। যাঁরা মীলাদ পড়ে অর্থ উপার্জন করে বেড়ান, কৈ তাঁরা তো কোনদিন খরচ করে মীলাদ পড়ান না? নাকি শিষ্যের ঘরের চালে কাক বসে শিষ্যের পাপের কারণে। আর গুরুর ঘরের চালে কাক বসে কাকের পাপ ক্ষয় করার জন্যে? বুদ্ধিমান মানুষরা বুঝে না কেন?

অনেকে ফাতেহাখানী, কুরআনখানী প্রভৃতি করে তার সওয়াব তাঁদের জন্য (যেমন আম্বিয়াদের নামে) বখশে দেয় -যাঁরা সওয়াবের মুখাপেক্ষী নন। সুতরাং এমন কাজ বিদআত ও ফালতু বৈ কি?

পক্ষান্তরে অন্যান্য আমল বা পদ্ধতি দ্বারা ঈসালে সওয়াব করলে তা বেসরকারী ডাকে ইরসাল হবে যা সঠিক ঠিকানায় পৌঁছবে না। সুতরাং মাইয়্যেতের তরফ থেকে তওবা করা, নামায পড়া, নিজের অথবা ভাড়াটে ক্বারীদের কুরআনখানী, ফাতিহাখানী, কুলখানী, শবীনা পাঠ, চালসে, চাহারম, নিয়মিত বাৎসরিক দুআ মজলিস ইত্যাদি কোন মতেই ঈসাল বা 'রিসিভড্' হবে না। *(আহকামুল জানাইয, মু'জামুল বিদা' ১৩৫পৃঃ)*

ভাড়াটিয়া কারীর কুরআন খানী, ফাতেহা খানী, কুল খানী, শবিনা খানী, চালসে, চাহারম, মীলাদ পাঠ ইত্যাদি যা ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয় সমস্তই বিদআত। এসব মৃতের কোন কাজে আসে না। উপরন্তু মৃত ব্যক্তি যদি নাস্তিক বা কাফের অথবা মুশরিক হয়, তাহলে তার আত্মার কল্যাণ উদ্দেশ্যে এমন দুআ মজলিস করা বা দুআ করাই হারাম। *(সূরা তাওবাহ ১১৩ আয়াত)*

উরস-উৎসব

আল্লাহর অলী আল্লাহর বন্ধু। তাঁরা আল্লাহর সাথে শির্ক অবশ্যই পছন্দ করেন না, করতে পারেন না। তাঁরা শির্ক সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করে থাকেন। তাঁদের ইন্তিকালের পর তাঁদেরকে কেন্দ্র করে কোন শির্ক হোক তা তাঁরা

তবুও এমন শির্কী ও বিদআতী মেলায় অংশগ্রহণ করে বহু ভক্ত অর্থ ব্যয় করে আসে। কিন্তু বড় দুঃখ হয় সেই ভক্তদের দেখে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অর্থ উপার্জন করে তা নিজের মা-বাপ ও স্ত্রী-পরিজনের উপর খরচ না করে লুটিয়ে আসে ঐ মেলায়! আর সেই সাথে শির্ক, বিদআত তথা কাবীরা গোনাহর 'ফয়য' ও পাথেয় হাসিল ও সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরে।

দূর-দূরান্ত থেকে এক এক আশা নিয়ে লোকেরা অলীর দর্গা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করে; অথচ তা ইসলামে বৈধ নয়। বৈধ নয় কোন কিছু কেনা-বেচার জন্যও এমন মেলায় উপস্থিত হওয়া।

'উরস' কথাটি আরবী হলেও তার আসল অর্থ বিবাহ-অনুষ্ঠান ও তার ভোজ-উৎসব। কিন্তু পরবর্তীতে লোকেরা তাকে নৈবেদ্য চড়ানো অনুষ্ঠানের অর্থে ব্যবহার করে বাৎসরিক মেলার আয়োজন করে অলীর নামে নৈবেদ্য চড়িয়ে থাকে। আর সেই সাথে 'উরস মুবারক' বা 'উরস পাক' নামকরণ করে তাকে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের রূপ দান করা হয়। অথচ ধর্মের সাথে এ অনুষ্ঠানের নিকট অথবা দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

ফাতিহা ইয়াযদহম

শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ)-এর অফাত উপলক্ষ্যে এই দিন পালিত হয়। ফারসী ভাষায় 'ইয়াযদহম' মানে ১১তম। যেহেতু রবিউস সানী মাসের ১১ তারীখে তাঁর অফাত হয় সে জন্য এই দিনটিকে 'ফাতিহা ইয়াদহম' নামে স্মরণ ও পালন করা হয়। ১১ তারীখের রাতে তাঁর নামে কুরআন-খতম ও মীলাদ-মাহফিল করে লোকেরা 'ফয়য' হাসিল করে থাকে।

আমরা জানি যে, ইসলামে ব্যক্তিপূজার কোন স্থান নেই। খোদ মহানবী ﷺ-এর জন্ম-মৃত্যুদিবস পালন করা বিদআত। সুতরাং তাঁর পরে আর কার জন্ম-মৃত্যুদিবস পালন করা বিধেয় হতে পারে? তাছাড়া তাঁর নামে যা করা হয় তাও তো বিদআত। বলা বাহুল্য, ঐ দিনে ছুটি মানানো বা কাজ-কর্ম বন্ধ করে

কোনক্রমেই চাইতে পারেন না। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, মানুষ তাঁদেরকে ভুল বোঝে এবং তাঁদেরকে নিয়ে তাই শুরু করে দেয় যা তাঁরা পছন্দ করেন না; পছন্দ করেন না তাঁদের একমাত্র মা'বূদ মহান আল্লাহ।

মানুষ মারা গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। মধ্যজগতে না কোন নামায থাকে, না কোন দুআ। আর না থাকে সে জগতের মানুষের সাথে এ জগতের মানুষের কোন সম্পর্ক। আওলিয়া হলেও তাঁরা সে জগৎ থেকে এ জগতের কোন আহবান শুনতে পান না; পারেন না কারো আহবানে সারা দিতে। তবুও মানুষ নিজের প্রয়োজনে সরাসরি মহান প্রতিপালক ও একক মা'বূদকে না ডেকে কোন অলীকে মাধ্যম করে; ভাবে তিনি তার দুআ আল্লাহর দরবারে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু সে ধারণা যে আদৌ সঠিক নয় তা মাত্র অল্প লোকেই বোঝে।

আল্লাহর শানে ভুল বুঝে এবং তাঁর আওলিয়াদের প্রতি ভক্তির আতিশয্যে লোকে তাঁদের কবরের কাছে জমায়েত হয়। বৎসরান্তে একবার সেখানে বড় ভক্তি ও আগ্রহের সাথে ভক্তরা নিজ নিজ নযর-নিয়ায ও হাদিয়া-উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হয়। সেখানে কামনা-বাসনা পূর্ণ হওয়ার আশা করা হয়। মহাঘটা ও সমারোহের সাথে অনুষ্ঠিত হয় উরস-উৎসব।

উরসে ঐ কবর যিয়ারতে অতীব পুণ্যলাভ হওয়ার আশা করে লোকে, 'ফয়যে আম' অর্জন করার আশা পোষণ করে, নফল রোযা রেখে মাযার যিয়ারত করে।

উৎসব-মুখর ঐ স্থানে মেলা লাগে! আল্লাহর আওলিয়া যা পছন্দ করেন না তাই হয় সেখানে। কোন কোন উরস-মেলায় গান-বাজনা হয়, নাটক-যাত্রা, সিনেমা-সার্কাস এবং আরো অন্যান্য চিত্তরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশা ঘটে। প্রদর্শিত হয় নারীর সেই রূপ ও সৌন্দর্য যা দেখা ও দেখানো অবৈধ।

শির্ক-বিদআত ও কাবীরা গোনাহ পরিবেষ্টিত এমন পরিবেশ কি আল্লাহর কোন অলী পছন্দ করতে পারেন?

ঘুরানো এবং সেই সাথে আলো ও গান-বাজনার সুব্যবস্থা করা, রঙ মাখামাখি করা, দিবারাত্রি মাইকে রেকর্ড বাজিয়ে, সি-ডি অথবা ভিডিওর মাধ্যমে ফিল্ম দেখিয়ে মহল্লা বা গ্রামকে উৎসব-মুখর করে তোলা, কত লোকের ডিষ্টার্ব ও কত লোকের ইবাদতের ক্ষতি করা, কত যুবক-যুবতীকে অবাধ-মিলামিশার সুযোগ করে দেওয়া, ফিল্ম-প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের চরিত্র নোংরা করা অন্ততঃপক্ষে একজন পূর্ণ ঈমানদার মুসলিমের কাজ হতে পারে না।

লজ্জাস্থানের এক টুকরা চামড়া কেটে ফেলার সময় গোপনীয়তা ও লজ্জাশীলতাই থাকা প্রয়োজন সকলের মনে। এর জন্য আনন্দ উৎসব করা সুরুচিপূর্ণ সভ্য পরিবেশের লক্ষণ নয়।

বাকি থাকল ঐ উপলক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজন ও মিসকীনদেরকে কেবল দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর কথা। যাঁরা দাওয়াত দেওয়া ও খাওয়া জায়েয মনে করেন, তাঁরা আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-এর কর্মকে দলীল মনে করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর ছেলেদের খতনার সময় ভেঁড়া যবাই করে খাইয়েছিলেন। *(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ১৭১৬০, ১৭১৬৪নং)*

পক্ষান্তরে খতনা বা মুসলমানি উপলক্ষ্যে দাওয়াত দেওয়া ও খাওয়া আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে ছিল না বলে বর্ণনা দিয়েছেন সাহাবী উষমান বিন আবীল আস। একদা তাঁকে খতনা-ভোজের দাওয়াত দেওয়া হলে তিনি তা কবুল করতে অস্বীকার করলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে খতনা-ভোজে হাযির হতাম না এবং আমাদেরকে সে উপলক্ষ্যে দাওয়াতও দেওয়া হতো না। *(আহমাদ ৪/২১৭, ত্বাবারানীর কাবীর ৯/৫৭)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তাঁকে এক দাওয়াতে আহবান করা হলে বলা হল, আপনি কি জানেন, এটা কিসের দাওয়াত? এটা হল এক বালিকার খতনা উপলক্ষ্যে দাওয়াত। তিনি বললেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে এটাকে বৈধ মনে করতাম না। অতঃপর তিনি সে দাওয়াত খেতে অস্বীকার করলেন। *(ত্বাবারানীর কাবীর ৯/৫৭)*

আর এই জন্য বহু উলামা বলেন, খতনার দাওয়াত বিদআত। উলামা

হালোয়া-রুটি খেয়ে আনন্দ করা শরীয়তসম্মত কাজ নয়।

বিভিন্ন লৌকিকতার অনুষ্ঠান

মুসলমানি (খতনা) উৎসব

ইসলামে মুসলিম শিশুর খতনা বা মুসলমানি (লিঙ্গত্বকচ্ছেদ) করা বিধেয়। এতে বহু যৌনরোগের হাত হতে মুক্তির উপায় আছে। তাছাড়া এতে রয়েছে দাম্পত্য সম্ভোগ-সুখের পূর্ণ তৃপ্তি ও রহস্য। এটা মানুষের এক সুরুচিপূর্ণ প্রকৃতি। তারই উপর রয়েছে ইসলামের সুন্দর স্বাস্থ্যবিধান।

তবে যে লিঙ্গত্বকহীন অবস্থায় জন্মেছে, তার খতনা নেই এবং তার লিঙ্গের উপরে ক্ষুর বা চাকু বুলানো অথবা পান কাটা ইত্যাদি আচার বিধেয় নয়। বরং তা অতিরিক্ত বিদআত কাজ। তবে বাড়তি ঐ চামড়ার কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকলে তা কেটে ফেলা দরকার। অনুরূপভাবে যদি কোন শিশু খুব দুর্বল হয় অথবা কেউ বৃদ্ধ অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং খতনা করায় কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে তাদের জন্য তা জরুরী নয়।

খতনা করার কোন বাঁধা-ধরা সময় নেই। তবে কৈশরের পূর্বে করাটাই উত্তম। যাতে বড় হয়ে শরমগাহ দেখাতে না হয়। আর এ জন্যই খতনার সময় নারী-পুরুষ জমায়েত হয়ে বিয়ের মত অনুষ্ঠান করে সকলের সামনে লিঙ্গত্বক কাটা বৈধ নয়। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ১৪/১২)*

বৈধ নয় খতনার জন্য শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, উপহার নেওয়া এবং সেই সাথে গীত-পার্টি মেয়েদের বাজনা সহ গীত গাওয়া, নাচা ও কাপ করা।

শিশুকে সুসজ্জিত করে রিক্সা পাল্কি বা ঘোড়ায় বসিয়ে পাড়া, গ্রাম বা শহর

আহলে হাদীসের ফতোয়ায় বলা হয়েছে, খতনা করার সময় যিয়াফত বিদআত। *(ফাতাওয়া আহলে হাদীস ২/৫৪৯)*

বলাই বাহুল্য যে, হুযুরদেরকে দাওয়াত দিয়ে ঐ দিনে বা তার আগের দিনে নসীহত করা অথবা মীলাদ পড়া অতঃপর উদরপূর্তির অনুষ্ঠান করাও বিদআত।

বিবাহে ক্ষীর খাওয়ানোর উৎসব

বিবাহের ৩ অথবা ৭ দিন আগে প্রত্যহ রাত্রে পাত্র-পাত্রীর মুখে ক্ষীর দেওয়ার দেশাচার রয়েছে প্রায় সব ঘরেই। সাধারণতঃ এ প্রথা পার্শ্ববর্তী পরিবেশ থেকে ধার করা বা অনুপ্রবেশ করা প্রথা। আর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করে, সে তাদেরই দলভুক্ত।" *(মিশকাত ৪৩৪৭নং)*

এমন মহিলারা পাত্রের ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে তার মুখে ক্ষীর-মিষ্টি দেয়, যাদের জন্য ঐ পাত্রকে দেখা দেওয়াও হারাম! অনেক সময় উপহাসের পাত্রী (?) ভাবী, নানী হলে হাতে কামড়েও দেওয়া হয়! বরং পাত্রও ভাবীর মুখে তুলে দেয় প্রতিদানের ক্ষীর! অথচ এই "স্পর্শ থেকে তার মাথায় সুচ গেঁথে যাওয়াও উত্তম ছিল।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৬নং)* অনুরূপ করে পাত্রীর সাথেও তার উপহাসের পাত্ররা! বরং যে ক্ষীর খাওয়াতে যায় তার সাথেও চলে পাশ থেকে বিভিন্ন মস্করা।

এই সাথে চলে 'গীত-পার্টি' যুবতীদের ধুমের গীত। শুধু গীতই নয় বরং অশ্লীল গীত ও হাততালি সহ ঢোল-বাদ্য বাজিয়ে গীত। এর সঙ্গে থাকে 'লেডি ড্যান্স' বা নাচ। আর শেষে বিভিন্ন অশ্লীল ও অবৈধ অভিনয় বা 'কাপ'! অভিনয়ে থাকে কারো মরণ-মুহূর্তে অথবা জন্মদান-মুহূর্তে ঘটিত নানা ঘটনা। তাতে থাকে কত ব্যঙ্গ, কটাক্ষ ও অশ্লীলতা। ঠাট্টা করা হয় দ্বীনদার সাদাসিধে মানুষদেরকে নিয়ে। এমন পরিস্থিতি দেখে-শুনে প্রত্যেক রুচিবান মুসলিম তা

ঘৃণা করতে বাধ্য। কিন্তু বহু রুচিহীন গৃহকর্তা এসব দেখে-শুনেও শুধু এই বলে ভ্রূক্ষেপ করে না যে, 'আম কালে ডোম রাজা, বিয়ে কালে মেয়ে রাজা।' ফলে ইচ্ছা করেই অনুগত প্রজা হয়ে তাদেরকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেয় অথবা মেয়েদের ধমকে বাধ্য হয়েই চুপ থাকে। তাই নিজ পরিবারকে নির্লজ্জতায় ছেড়ে দিয়ে বাড়ির বাইরে রাত কাটাতেও লজ্জা করে না। অথচ "গৃহের সমস্ত দায়িত্ব সম্পর্কে কিয়ামতে গৃহকর্তার নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।" *(মিশকাত ৩৬৮৫নং)*

এই ধরনের অসার ও অশ্লীল মজলিসে কোন মুসলিম নারীর উপস্থিত হওয়া এবং ক্ষীর খাওয়ানো নিঃসন্দেহে হারাম। যেমন মহিলাদের এই কীর্তিকলাপ দর্শন করা বা নাচে ফেরি দেওয়া পুরুষদের জন্য বিশেষভাবে হারাম। এমন নাচিয়েকে ফেরি দেওয়ার বদলে তার কোমর ভেঙ্গে দেওয়া উচিত মুসলিমের - বিশেষ করে তার অভিভাবকের। কিন্তু হায়! 'শাশুড়ী যদি দাঁড়িয়ে মুতে, তাহলে বউ তো পাক দিয়ে দিয়ে মুতবেই!' বেড়া খেত খেলে, খেতের অবস্থা আর কি হবে?

আইবুড়ো বা থুবড়া ভাতের (অবিবাহিত অবস্থার শেষ অন্নগ্রহণের) অনুষ্ঠানও বিজাতীয় প্রথা। এই দিনের ক্ষীর-সিন্নি বিতরণও বিদআত। বরং পীরতলায় বিতরণ শির্ক। আর এই দিন সাধারণতঃ পাকান বা বাতাসা বিতরণ (বিক্রয়ের) দিন। যাদেরকে এই পাকান বা মিষ্টি দেওয়া হবে তাদেরকে পরিমাণ মত টাকা দিয়ে 'ভাত' খাওয়াতেই হবে; না দিলে নয়। এই লৌকিকতায় মান রাখতে গিয়েও অনেকে লজ্জিত হয়। সুতরাং এসব দেশাচার ইসলামের কিছু নয়।

এই দিনগুলিতে 'আলমতালায়' (ছাঁদনাতলায়) বসার আগে পাত্র-পাত্রীর কপাল ঠেকিয়ে আসনে বা বিছানায় সালাম বিদআত। কোন বেগানা (যেমন বুনাই প্রভৃতির) কোলে চেপে আলম-তালায় বসা হারাম। নারী-পুরুষের (কুটুম্বদের) অবাধ মিলা-মিশা, কথোপকথন মজাক-ঠাট্টা, পর্দাহীনতা প্রভৃতি ইসলাম বিরোধী আচরণ ও অভ্যাস। যেমন রঙ ছড়াছড়ি করে হোলী (?) ও কাদা খেলা প্রভৃতি বিজাতীয় প্রথা। এমন আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান ইসলামে

অনুমোদিত নয়।

সুতরাং মুসলিম সাবধান! তুলে দিন 'আলমতালা' নামক ঐ 'রথতালা'কে পরিবেশ হতে। পাত্র-পাত্রীও সচেতন হও! বসবেনা ঐ 'রথতালা'তে। ক্ষীর খাবে না এর-ওর হাতে। কে জানে ওদের হাতের অবস্থা কি? ছিঃ!

বিবাহের প্রচার অবশ্যই দরকার। ইসলামী প্রথায় বাসরের দিনে বা রাত্রে বিবাহের প্রচার জরুরী। 'দুফ্' (আটা-চালা চালুনের মত দেখতে ঢপ্ঢপে আওয়াজবিশিষ্ট এক প্রকার ঢোলক) বাজিয়ে ছোট ছোট বালিকা মেয়েরা শ্লীলতাপূর্ণ গীত গাইবে। কিন্তু অন্য বাদ্যযন্ত্র দ্বারা অথবা অশ্লীল, প্রেম-কাহিনীমূলক, অসার, অর্থহীন গীত বা গান গাওয়া ও শোনা হারাম। এই দিনে ইসলামী গজল গেয়ে আনন্দ করাই বিধিসম্মত; তবে তাতেও যেন শির্ক ও বিদ্আতের গন্ধ না থাকে। এই খুশীতে রেকর্ডের গান, মাইকের গান, সিডি ও ভিডিও প্রদর্শন প্রভৃতি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। *(আদাবুয যিফাফ, আলবানী ১৭৯-১৮০পৃঃ দ্রঃ)*

এরই মাঝে আসে তেল নামানোর পালা। ঝোমর ডালা হয় পাত্র বা পাত্রীকে কেন্দ্র করে হাততালি দিয়ে গীত গেয়ে ও প্রদক্ষিণ করে!

এ ছাড়া আছে শিরতেল ঢালার অনুষ্ঠান। সধবারা হাতের উপরে হাত রাখে, সবার উপর নোড়া রাখে খাড়া করে, তার উপর তেল ঢালা হয় এবং তা পাত্রীর মাথায় গড়িয়ে পড়ে। এই সঙ্গে আরো কত কি মেয়েলি কীর্তি। তাছাড়া এ প্রথা সম্ভবতঃ শিবলিঙ্গ পূজারীদের। কারণ, অনেকেই এই প্রথাকে 'শিবতেল ঢালা' বলে থাকে। তাছাড়া এর বড় প্রমাণ হল শিবলিঙ্গের মত ঐ নোড়া!

সুতরাং যে মুসলিম নারীরা মূর্তিপূজকদের অনুরূপ করে তারা রসুলের বাণীমতে ওদেরই দলভুক্ত। আর এদের সঙ্গে দায়ী হবে তাদের অভিভাবক ও স্বামীরাও।

বিবাহের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিও ক্যামেরা দ্বারা অথবা ফটোগ্রাফী দ্বারা স্মারক ছবি তুলে রাখায় দুই পাপ; ছবি তোলার পাপ এবং বিভিন্ন মহিলাদেরকে দেখা ও দেখানোর পাপ।

আতশ বা ফটকাবাজীও বৈধ নয়। কারণ, আগুন নিয়ে খেলা অবৈধ, এতে বিপদের আশঙ্কা অনেক, তাছাড়া এতে অপব্যয় হয় অথচ উপকার কিছু হয় না। উল্টে লোককে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিরক্ত করে তোলে। সুতরাং মুসলিম হুশিয়ার!

ব্যাঙের বিয়ে

এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা মাদারের বিয়ে দিয়ে থাকে এবং মাদার তলা নির্বাচিত করে মাটির হাতি-ঘোড়া পেশ করে সেখানে ধূপ-মোমবাতি জ্বালিয়ে পূজা করে থাকে! প্রতিবেশীর পরিবেশ দ্বারা তারা এতই প্রভাবান্বিত যে, তাদের পূজার আনন্দ দেখে আর লোভ সামলাতে না পেরে পূজার মৌসম আবিষ্কার করে পূজার ধুম মাচিয়ে থাকে। সুতরাং ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন।

অন্য এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা ধর্মকে খেল-তামাশার বিষয় মনে করে থাকে। আকাশে বৃষ্টি না হলে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষরা যেখানে নিজ প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করে কেউ বা কাকুতি-মিনতি সহকারে দুআ করে কান্নাকাটি করে, কেউবা ইস্তিগফার করে এবং অনেকেই ইস্তিস্কার নামায পড়ে থাকে। হাত দুটিকে খুব উঁচু করে তুলে সৃষ্টিকর্তা বৃষ্টিদাতার নিকটে বৃষ্টিবর্ষণের জন্য আকুল আবেদন জানিয়ে থাকে। সেখানে ঐ শ্রেণীর মানুষরা বৃষ্টির জন্য রাগী লোকের চুলো ভেঙ্গে আসে অথবা তার গায়ে নোংরা ফেলে দেয়। আর ভাবে যে, সে রেগে গালাগালি করলেই আকাশে মেঘ আসবে, বৃষ্টি হবে, ফসল ফলবে!

অনুরূপ নারী-পুরুষ একত্রে উপহাসের পাত্র-পাত্রীরা (?) খেল খেললে, আপোসে রঙ কিংবা কাদা মাখামাখি করলে বৃষ্টি হবে মনে করে আর এক শ্রেণীর মূর্খ মানুষ।

অনেক মুশরিক জাহেল এও ধারণা ও বিশ্বাস রাখে যে, কোলা ব্যাঙের বিয়ে

দিলে আল্লাহ খুশী হয়ে বৃষ্টি দেবেন! আর সেই জাহেলী ধারণামতে ব্যাঙ ধরে তেল-হলুদ মাখিয়ে কাপড় পরিয়ে আলমতালায় বসিয়ে গীত-বাজনা করে ক্ষীর খাওয়ায়! কোন কোন এলাকায় গাধা-গাধীর বিবাহও দেওয়া হয়!

আসলে এই ফাঁকে তাদের আনন্দ করার একটি সুযোগ আর কি? কিন্তু আনন্দ করার অবকাশ তো অনাবৃষ্টির সময় নয়। এই সময়ে ধান হবে না এই আশঙ্কায় কত মানুষের চোখে ঘুম আসে না। আর এরা করে আমোদ-ফূর্তি! কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ। কারো মোজ হয়, কেউ আমাশয় যায়।

এমন জাহেলী ও শির্কী আনন্দে কোন মুসলিম শরীক হতে পারে না। না ঐ জাহেলদেরকে জায়গা দিয়ে, আর না-ই কোন প্রকার চাঁদা দিয়ে। বরং আল্লাহর আদেশমত আপনিও বলুন,

﴿ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَزَهَقَ ٱلۡبَٰطِلُۚ إِنَّ ٱلۡبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقٗا ﴾ (الإسراء ٨١)

অর্থাৎ, হক এসে গেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নিশ্চয় বাতিল বিলীয়মান। *(সূরা ইসরা ৮১ আয়াত)*

এমন জাহেল স্ফূর্তিবাজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ করুন। যেহেতু আপনার নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন গর্হিত (বা শরীয়ত বিরোধী) কাজ হতে দেখবে, তখন সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তিত করে। তাতে সক্ষম না হলে যেন তার জিহ্বা দ্বারা, আর তাতেও সক্ষম না হলে তার হৃদয় দ্বারা (তা ঘৃণা জানবে)। তবে এ হল সব চাইতে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক।" *(মুসলিম ৪৯নং, আহমাদ, আসহাবে সুনান)*

ঘর ইকামত

নতুন ঘর বানানোর পর ঘরে এসে খুশী হয়ে আত্মীয়-স্বজন ও গরীব-মিসকীনকে ভোজ করে খাওয়ানো দোষের নয়। তাতে তো আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হয়। কিন্তু নূতন গৃহ উদ্বোধনের উদ্দেশ্য যদি ঘরের বর্কত আনা হয়, অথবা সেখানে জিন বাস করতে পারে এই আশঙ্কায় মৌলবী-তালেবে ইল্ম

ডেকে কুরআন খানী করে অথবা মীলাদ পড়ে খাস জামাআতী দুআ করে ঘর ইকামত করা হয়, তাহলে তা অবশ্যই বিদআত।

ঠিক ঘরের বর্কত নিশ্চিহ্ন দেখে অথবা কোন কল্পিত জিনের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য খরচ করে ঘরের কোণে কোণে মাটির ভাঁড়ের মধ্যে লোহার পেরেক পোঁতা, বাঁশ পুঁতে তার ডগায় আয়না লটকানো এবং দরজায় দরজায় তাবীয চিটানো শির্ক ও বিদআত। এই শির্ক সাধারণতঃ ঈমান ও মনের দিক থেকে দুর্বল শ্রেণীর লোকেরাই করে থাকে। এই শির্কে মানুষের কাজ হলেও তা মানসিকভাবে কাজের ফল দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ তার মন সেই বন্ধের প্রতি লটকে থেকে মনের মধ্যে একটা বল সৃষ্টি হয়। আসলে কিন্তু তাতে লাভ কিছুই হয় না।

পক্ষান্তরে ঘর থেকে বর্কতহীনতা ও জিন দূর করার পদ্ধতি রয়েছে শরীয়তে। কিন্তু সমস্যা হল, শরীয়ত জানে ও মানে কে এবং জানার পর সেই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে কে?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানিও না। যে গৃহে সূরা বাক্বারাহ পঠিত হয় সে গৃহ হতে শয়তান পলায়ন করে।" *(মুসলিম ৭৮০ নং)*

হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, একদা তিনি ফিতরার যাকাতের মাল পাহারা দিচ্ছিলেন। কয়েক রাত্রি শয়তান এসে মাল চুরি করে নিয়ে যায়। অবশেষে শেষরাত্রে সে তাঁকে বলে যায়, 'বিছানায় শয়ন করে "আয়াতুল কুরসী" { [illegible] } শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করো। এতে তোমার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে এক হিফাযতকারী হবে। ফলে শয়তান সকাল পর্যন্ত তোমার নিকটবর্তী হতে পারবে না।

আবু হুরাইরা ﷺ একথা নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "জেনে রেখো, ও সত্যই বলেছে অথচ ও ভীষণ মিথ্যুক। তিন তিন রাত্রি তুমি কার সহিত কথা বলেছ তা জান কি আবু হুরাইরা?" (আবূ হুরাইরা বলেন,) আমি বললাম, 'না।' (রসূল ﷺ বললেন, "ও ছিল শয়তান!" *(বুখারী ৩২৭৫নং, ইবনে খুযাইমা, প্রমুখ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাত্রে সূরা বাক্বারার শেষ দুটি আয়াত পাঠ

করবে, তার জন্য সকল বস্তুর অনিষ্ট হতে ঐ দুটিই যথেষ্ট করবে।” *(বুখারী ৫০০৮ নং, মুসলিম ৮০৭ নং)*

অন্য দিকে ঘরের বর্কত নষ্ট করে থাকে নিজেরাই। ঘরের লোকে এমন কাজ করে, যাতে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হতে বাধা দেয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহর (রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর অথবা মূর্তি বা ছবি থাকে।” *(বুখারী ৫৯৫৮, মুসলিম ২১০৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

সুতরাং মন থেকে দুর্বলতা ও সকল কুসংস্কার দূরীভূত করুন। ঘর থেকে দূর করুন সকল প্রকার বেবর্কত আনয়নকারী বস্তু। আর সেই সাথে ব্যবহার করুন শরীয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট চিকিৎসা-পদ্ধতি। আল্লাহ আপনার গৃহে বর্কত দেবেন, ঘরকে জিনমুক্ত করবেন এবং আপনার মনকে করবেন শির্কমুক্ত।

নিছক বিজাতীয় পরব

জয়ন্তী বা জুবিলী

ফরাসী ভাষায় jubile, ল্যাটিন ভাষায় jubiaeus এবং হিব্রু ভাষায় yobel এই তিনের অর্থ যা, ইংরেজী Jubilee অর্থও তাই। প্রামাণ্য ইংরেজী অভিধানে জুবেলী অর্থ করা হয়েছে The blastt of a trampet. Blast অর্থ প্রবল বাত্যা, ঝঞ্ঝা, বিস্ফোরণ। আর Trampet অর্থ ভেঁপু, ভেরীধ্বনী ইত্যাদি। আভিধানিক অর্থকে সামনে রেখে জুবিলী অর্থ হয়, মহোৎসব, মহাআনন্দ উৎসব ইত্যাদি।

রজত, সুবর্ণ ও হীরক জয়ন্তীর ইতিহাস যতটুকু জানা যায়, তা হচ্ছে এই,

সিলভার জুবিলী বা রজত জয়ন্তী ঃ

রোমান ক্যাথলিক গীর্জাগুলোর প্রতি পঁচিশ বছর পর জাঁকজমকের সাথে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উৎসব পালন করে থাকে। এ উৎসবের নাম তারা দিয়েছে, ‘সিলভার জুবিলী।’

গোল্ডেন জুবিলী, সুবর্ণ বা স্বর্ণজয়ন্তী ঃ

পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে ইয়াহুদীগণ কর্তৃক পালনীয় উৎসব বিশেষ। এ সময়ে তারা ক্রীতদাসদেরকে (দাসত্ব থেকে) এবং ঋণদাতাদের (ঋণ থেকে) মুক্ত করে পুণ্য লাভ করে। দীন-দুঃখীদেরও দান করে থাকে।

ইয়াহুদীরা এই অনুষ্ঠানকে মনে করে পাপ মুক্তির অনুষ্ঠান, অন্য দিকে তারা এটাকে আনন্দ অনুষ্ঠানও মনে করে থাকে।

ডায়মন্ড জুবেলী বা হীরক জয়ন্তী ঃ

ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে আনন্দানুষ্ঠান। প্রথমে এক শ্রেণীর খ্রীষ্টান (সম্ভবতঃ প্রোটেষ্টান্ট) যাদের বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হত, তারা হীরক জয়ন্তী পালন করত। পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানের বয়স ৬০ বছর হলে সাড়ম্বরে এই অনুষ্ঠান পালন করতে থাকে। যে প্রথা বর্তমানেও প্রচলিত।

লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত তিনটি জুবেলী অনুষ্ঠানের সাথে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক নেই। একটি রোমান ক্যাথলিকদের অনুষ্ঠান, অপরটি ইয়াহুদীদের অনুষ্ঠান, তৃতীয়টিও খ্রীষ্টানদের অনুষ্ঠান। তিনটিরই উদ্ভব ঘটেছে ধর্মীয় উৎস থেকে। এ ছাড়া জয়ন্তীর উৎসও অন্য বিজাতি থেকে। *(শব্দ-সংস্কৃতির ছোবল, জহুরী ৩২-৩৩পৃঃ দ্রঃ)*

জয়ন্তী মানে ঃ পতাকা, ইন্দ্রকন্যা, দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি বা জন্মরাত্রি, যে কোন ব্যক্তির জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব।

অতএব বলাই বাহুল্য যে, বিজাতিদের অনুকরণে মুসলিমরা সে সব অনুষ্ঠান পালন করতে পারে না।

স্বাধীনতা-দিবস

স্বাধীনতা-দিবস, জাতীয়-দিবস, গণতন্ত্র-দিবস, শহীদ-দিবস ইত্যাদি দিবস দেশাচার ও রাজনৈতিক ব্যাপার হলেও তাও এক শ্রেণীর জাতীয় ঈদ। আমরা ইচ্ছা করলেই কোন ঈদ বা খুশীর দিন নিজেরা তৈরী করে নিতে পারি না।

কেননা, আমাদের ইচ্ছা আমাদের সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার সাথে বাঁধা। আমরা মুসলিম অর্থাৎ (আল্লাহর নিকট) আত্মসমর্পণকারী। সুতরাং আমরা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিরূপে কোন ঈদ বা খুশীর দিন আবিষ্কার করে নিতে পারি? তাঁর অনুমতি ও অনুমোদন না থাকলে আমাদের তো কিছুই করার থাকে না।

এই সকল দিবস পালন করাতে কিছুই না থাকলেও বিজাতির অনুকরণ তো রয়েছেই। তাতে রয়েছে শরীয়ত-বিরোধী নানা কার্য-কলাপ ও অনুষ্ঠান। সুতরাং এগুলিও বিদআত ও শরীয়ত-পরিপন্থী আনন্দ-দিবস। *(অফাদারী ২৮৭-২৮৭ দ্রঃ)*

আপনি বলতে পারেন, হুঁঃ! এটা বিদআত, ওটা বিদআত, তাহলে সুন্নত কোন্টা? আনন্দ করার কি কোন উপায় নেই ইসলামে?

সুন্নত কোন্টা সেটাই তো শিখতে বলছি আপনাকে। আপনার যা কিছু আছে তা অনেক কিছু। কিন্তু না জেনে পরের নিয়ে খোশ কেন আপনি? নিজ স্বকীয়তা বিকিয়ে অপরের সাথে একাকার হওয়ার মানে কি এই নয় যে, আপনি দুর্বল, আপনি অপরের পা-চাটা গোলাম? সৃষ্টিকর্তার দেহ-মন নিয়ে আনন্দ করবেন, তাতে অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার অনুমতি হতে হবে। এ কথা আপনি মানেন চাহে না মানেন।

আপনি বলেন চাহে না বলেন। আপনি বলতে বাধ্য যে,

﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ۝ ﴾ (الأنعام ١٦٢-١٦٣)

অর্থাৎ, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য; তাঁর কোন শরীক নেই। আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম। *(সূরা আনআম ১৬২-১৬৩ আয়াত)*

সহস্রাব্দ পালনের বিধান

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামে হিজরী ও ইসলামী মাস ও বছর তথা তারীখ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। তা বাদ দিয়ে বিধর্মীর তারীখ ব্যবহার করা প্রয়োজন ছাড়া বৈধ নয়। তা সত্ত্বেও হিজরী শতাব্দী বা সহস্রাব্দ পালন করার তরীকা ইসলামে নেই। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, বিজাতির সাল, শতাব্দী বা সহস্রাব্দ পালন করে অথবা তাদের তা পালন করা দেখে তাদের সাথ দিয়ে উৎসব ও আনন্দ করা বৈধ নয়।

এ ব্যাপারে শায়খ ইবনে জিবরীন বলেন ঃ

কাফেরদের কোন উৎসব-অনুষ্ঠানে মুসলিমদের অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। তাদের সাথে সামাজিক শিষ্টাচার বজায় রাখার খাতিরেও ঐ সব নব আবিষ্কৃত অবৈধ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। আসমানী কিতাবসমূহে এবং আল্লাহর শরীয়তে এ ধরনের কার্য-কলাপ বৈধ হওয়ার কোনই প্রমাণ নেই। বরং এ হল বিধর্মী খৃষ্টানদের উদ্ভাবিত এবং ইসলামী শরীয়ত বহির্ভূত কর্ম। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর কোন অনুমতি নেই।

আর এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে, বিধর্মী-অবিশ্বাসীদের ঐ সকল অনুষ্ঠান বা তাদের অন্য কোন ঈদ-উৎসবে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে তাদের আবিষ্কৃত অবৈধ কার্য-কলাপে স্বীকৃতি ও সমর্থন তথা বিজাতির তা'যীম ও সম্মান প্রকাশ হয়ে থাকে। সুতরাং এ উপলক্ষে আয়োজিত কোনরূপ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার খুশী ও আনন্দ প্রকাশ করা মুসলিমদের জন্য সম্পূর্ণরূপে হারাম।

মুসলিমদের কর্তব্য হল, ওদের নির্ধারিত উৎসব-অনুষ্ঠান বর্জন করে ঐ দিনটিকে বছরের অন্যান্য দিনের মতই সাধারণ একটি দিন মনে করা এবং তার বিশেষ কোন গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে বলে ধারণা না রাখা।

ঈমানদার মুসলিমগণ তো ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দিনসমূহেই আনন্দ উপভোগ করে থাকে, পরস্পর শুভেচ্ছা (ও দুআ) বিনিময় করে এবং তাতে যে সব নামায ও ইবাদত আছে তা পালন করে ঈদ উদ্যাপন করে। আর মহান আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ওলিম্পিক উৎসব

ওলিম্পিক গেমস্ হল প্রাচীন গ্রীসে প্রতি চার বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা এবং ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দ হতে আরব্ধ প্রতি চার বৎসরান্তিক বিশ্বক্রীড়াপ্রতিযোগিতার নাম।

ওলিম্পাস হল প্রধান প্রধান গ্রীক দেবতার আবাসরূপে পরিগণিত গ্রীসের কতিপয় পর্বতের নাম। বাস্তবে ওলিম্পিক গেমস্-এর সম্পর্ক কিন্তু গ্রীকদের ধর্মীয় উৎসবের সাথেই। আরবী বিশ্বকোষে বুত্রুস বুস্তানী বলেন, 'এই সকল খেলা প্রথমতঃ দ্বীনী উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছিল।' *(দায়েরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়্যাহ ৪/৬৮৫)*

আর এ জন্যই দ্বীনী-দৃষ্টিকোণ থেকেই ওলিম্পিক গেমস্ অনুষ্ঠিত করা, তাতে রাজনৈতিক গুরুত্ব দেওয়া এবং তাতে অংশগ্রহণ করা মুসলিমদের জন্য দুটি কারণে বৈধ নয়ঃ-

প্রথমতঃ এই খেলার আসল বুনিয়াদ হল পৌত্তলিকতা ও শির্ক। আর তার মৌসম গ্রীকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঈদের মৌসম বলে মানা হত। অতঃপর তাদের নিকট থেকেই রোমান ও খ্রিষ্টানরা গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ ওলিম্পিক তার প্রাচীন নামেই আজও প্রসিদ্ধ আছে; যে নাম নিয়ে তা আরম্ভ হয়েছিল। আর তার প্রাচীন নাম অবশিষ্ট থাকাই এ কথার দলীল হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে, এ খেলা মুসলিমদের জন্য অবৈধ ও নাজায়েয।

যাবেত বিন যাহহাক ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় এক ব্যক্তি নযর মানল যে, সে বুয়ানাহ নামক জায়গায় একটি উট কুরবানী (নহর) করবে। সুতরাং লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে এসে সে কথা উল্লেখ করল (এবং সে নযর পালন করতে কোন বাধা আছে কি না, তা জানতে চাইল)। নবী ﷺ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন? "সেখানে কি জাহেলী যুগের কোন পূজ্যমান প্রতিমা ছিল?" লোকেরা বলল, 'জী না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "সেখানে কি সে যুগের কোন ঈদ (মেলা) হত?" লোকেরা বলল, 'জী না।'

আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি তোমার নযর পালন কর। যেহেতু আল্লাহর নাফরমানী করে কোন নযর পালন করা যাবে না এবং আদম সন্তানের সাধ্যের বাইরে মানা কোন নযর পালন করতে হয় না।" *(আবূ দাঊদ ৩৩১৩নং, ত্বাবারানী)*

উক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কোন নির্দিষ্ট স্থানের অতীতের কোন শরীয়ত-বিরোধী; যেমন মেলা (বা উরস) ইত্যাদির সাথে সম্পর্ক থাকাটাই এ কথার দলীল যে, সেখানে কোন শরীয়ত-সম্মত কাজও করা যাবে না। অথচ নযরকারী যখন মহানবী ﷺ-কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন শরীয়ত-বিরোধী কোন কর্মকান্ড মজুদ ছিল না। সুতরাং স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ভিত্তিতে যদি কোন জিনিস হারাম ও নিষিদ্ধ হতে পারে, তাহলে নিজের প্রাচীন নাম ও দ্বীনী প্রতীকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে সে জিনিস অধিকরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ গণ্য হবে।

বলা বাহুল্য, ওলিম্পিক গেমস্ তো সর্বদিক থেকেই নিজের প্রাচীন ঐতিহ্য ও রূপ নিয়েই আজও বর্তমান আছে। যেমন এর প্রারম্ভিক উদ্বোধনের সময় আগুনের শিখা নিয়ে দৌড়া হয়, প্রত্যেক চার বছর পর অর্থাৎ পঞ্চম বছরে তা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাকে তার প্রাচীন নাম 'ওলিম্পিক' নামেই জানা ও প্রচার করা হয়। *(দেখুন ঃ মাজাল্লাতুল বায়ান ১৪৪ সংখ্যা, শা'বান ১৪২১হিঃ, ২৬-২৭পৃঃ, অফাদারী ইয়া বেযারী, মাকসূদুল হাসান ফায়যী ২৮৫পৃঃ)*

মাতৃদিবস

পিতামাতার সহিত সন্তানের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক। বছরে একবার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে সম্পর্ক বজায় করার কোন যুক্তিই মুসলিম সন্তানের কাছে থাকতে পারে না। যে সন্তানের মায়ের পদতলে রয়েছে বেহেশ্ত, সেই সন্তান বছরে একদিন মাতৃদিবস পালন করে বাকী কর্তব্য থেকে পলায়ন করবে কেন?

এই অনুষ্ঠান তাদের প্রয়োজন, যাদের ডানা বের হতেই মা-বাপের বাসা ছেড়ে উড়ে যায়। মা-বাপ হতে দূরে থেকে প্রেমিকা অথবা স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করে। যারা মা-বাপের খিদমত কি জিনিস তাই জানে না। যারা বৃদ্ধ মা-বাবাকে

ঘরে না রেখে বৃদ্ধ-খোঁয়াড়ে বন্দী রেখে আসে। যারা বছরে হয়তো একবারও মা-বাপের চেহারা দর্শনের অবসর অথবা চেষ্টা রাখে না।

কিন্তু যে সন্তানের মা-বাপের সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি, যে সন্তানের মা-বাপ কাফের হলেও তাদের সাথে দুনিয়ায় সদ্ভাবে বসবাস করতে বলা হয়েছে, যে সন্তান মা-বাপের অনুমতি ছাড়া (নফল) জিহাদেও যেতে পারে না, সে সন্তান 'মাতৃদিবস'-এর অনুষ্ঠান পালন করে কি করবে? মা-বাপকে সারা বছর খোশ না রেখে একদিন উপহার-পূজা দিলেই কি তারা খোশ হয়ে যাবে? নাকি তাদের প্রতি সকল কর্তব্য পালন হয়ে যাবে?

তবে কেন কুসন্তানদের মত সুসন্তানরাও সেই দিবস পালন করার জন্য পাল্লা ধরেছে? ইসলামের নির্দেশ কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয়?

কেন মুসলিম সন্তান আজ বিজাতির অন্ধানুকরণ করে? কেন বিজাতির প্রত্যেক প্রথাকে লুফে নিতে প্রগতি মনে করে? কেন সে আজ হীনম্মন্যতার শিকার? তার দ্বীন কি পরিপূর্ণ নয়? তার কাছে কি ইসলাম মনোনীত ধর্ম নয়? তবে কেন বিজাতির গড্ডলিকা-প্রবাহে প্রবাহমান হয়ে নিজের স্বকীয়তা বিলীন করে ফেলছে?

বলাই বাহুল্য যে, বিজাতির অনুকরণে ঐ দিবসে মায়ের জন্য উপহার-সামগ্রী পেশ করা, মা-কে নিয়ে আনন্দ-অনুষ্ঠান করা, খাস করে ঐ দিনে মায়ের সাক্ষাৎ করা ইত্যাদি বিদআত ও হারাম। *(দেখুন ঃ ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/১২৪, মাজমূউ ফাতাওয়া, ইবনে উষাইমীন ৩/৩০১)*

বিশ্ব-ভালোবাসা দিবস

সারা বিশ্বে অবৈধ প্রণয় বা ভালোবাসাকে পবিত্র করার জন্য, অবৈধ প্রেমে যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী ও কিশোর-কিশোরীকে অনুপ্রাণিত করার জন্য, পৃথিবীর নৈতিক চরিত্রের শত্রু এবং ব্যভিচারের ঠিকেদাররা যেমন প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য নানা প্রচার-মাধ্যম, রঙমহল, পার্ক, সমুদ্র-সৈকত, ঝিল ও উপবন প্রভৃতি রচনা করে রেখেছে, ঠিক তেমনই রচনা করেছে অবৈধ প্রেম

বৈধ করার বিভিন্ন আইন-কানুন, তৈরী করেছে প্রেম প্রকাশ করার ও ঝালিয়ে নেওয়ার মত স্মারক-দিবস। ভালোবাসা দিবস এমনই একটি দিবস।

১৪ই ফেব্রুয়ারী পালনীয় এই দিনটি কিন্তু খ্রিষ্টানদের। একে ওদের ভাষায় (Valentine Day) বলে। এই ঈদ প্রায় ১৭০০ বছর পূর্বে সৃষ্টি হয়। সে সময় রোমানরা ছিল পৌত্তলিক। উক্ত Valentine নামক সাধু খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলে সরকার তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়। পরবর্তীতে রোমানরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তার মৃত্যুর দিনকে প্রেমের শহীদদের স্মরণের দিনরূপে পালন করে। আর তখন থেকেই চালু হয়ে যায় ঐ ভালোবাসা দিবস।

ইউরোপ ও আমেরিকায় উক্ত দিবস সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বড় যত্ন ও গুরুত্ব পেয়ে যায়।

অবশ্য ঐ দিনটি রোমানদের নারী ও বিবাহের দেবী মহিমময়ী জুনো (Juno)কে স্মরণ করার জন্যও পবিত্ররূপে পালিত হয়ে থাকে।

আরো বলা হয়ে থাকে যে, একদা রোমান সম্রাট (ক্লাউডিউস) রোমের সকল পুরুষকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ করলে অনেক পুরুষ তাতে আগ্রহ দেখায় না। কারণ বিশ্লেষণ করলে জানতে পারে যে, সে সকল পুরুষরা হল বিবাহিত এবং তারা তাদের স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে যেতে রাজি নয়। এই জন্য সম্রাট বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। কিন্তু যাজক Valentine সম্রাটের সে আদেশ মানতে অস্বীকার করে এবং গোপনে গোপনে গীর্জার মধ্যে লোকেদের বিবাহ কাজ সম্পন্ন করতে থাকে। এ খবর পেয়ে সম্রাট তাকে গ্রেফতার করে ২৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তার প্রাণদন্ড দেয়। আর তার পর থেকে তার স্মরণে ঐ দিনকে প্রেমের দিন বলে পালন করা হয়।

অতঃপর গীর্জার তরফ থেকে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ইটালীতে Valentine Day পালন সরকারীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেহেতু তাদের মতে সেই উৎসব ছিল দ্বীন ও চরিত্র-বিরোধী অবাস্তব উপকথাভিত্তিক। কিন্তু সাধারণ লোকেরা তা আজও পর্যন্ত পালন করতে থাকে।

আল্লাহ মুসলিম যুবক-যুবতীকে সুমতি দিন। আমীন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

মসজিদ, মাদ্রাসা অথবা অন্য কোন ঘর বা প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়মিত চালু বা আরম্ভ করার জন্য অনুষ্ঠান করে মীলাদ পড়ে অথবা ফিতা কেটে অথবা হাত তুলে জামাআতী মুনাজাত করে উদ্বোধন করার প্রথা ইসলামের নয়। এ প্রথা আল্লাহর রসূল বা সাহাবা ও তাবেঈনদের যুগে প্রচলিত ছিল না এবং পবিত্র শরীয়তে এর কোন অনুমোদন নেই। অতএব তা আমাদের ভালো মনে করে করা বিদআত হবে।

কোন সাহাবীর বাড়িতে নফল নামায পড়ার জায়গা নির্দিষ্ট করার জন্য মহানবী ﷺ-এর সেখানে গিয়ে নামায পড়া এবং বাড়ির লোকের সে জায়গাকে মুবারক বলে গ্রহণ করার দলীলে মসজিদ-উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বৈধ হতে পারে না। কারণ, তা তো আসলে সাধারণ মসজিদ নয়। তা ছিল নিছক নফল নামায পড়ার জন্য বাড়ির ভিতরে একটি নির্দিষ্ট জায়গা। আর তাঁর ইন্তিকালের পর বর্কত নেওয়ার উদ্দেশ্যে কাউকে দাওয়াত দেওয়াও বৈধ নয়। বর্কত নেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন বড় ব্যক্তিত্বকে দাওয়াত দিয়ে ডেকে এনে ধুম করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করলে তা শির্ক বলে পরিগণিত হবে। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ১/১৮, ১২৫ দ্রঃ)*

মসজিদ সপ্তাহ

মসজিদ বা তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্যে 'মসজিদ-সপ্তাহ', বৃক্ষ রোপন ও তার প্রতি যত্ন নিতে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'বৃক্ষ-সপ্তাহ' বা সপ্তাহ কালব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উদ্দীপনার মাঝে অন্য কোন সপ্তাহ পালন করার কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই। যদি তা শরীয়ত জ্ঞান করে নির্দিষ্ট সপ্তাহে তা ঈদের মত পালন করা হয়, তাহলে তা বিদআতের

ঐ দিনে পাখিরা নিজ নিজ সঙ্গী নির্বাচন করে বলে রূপকথায় বর্ণিত আছে।

এই দিনে (সাধারণতঃ অবৈধ) প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রেম-হৃদয়ের সততা ব্যক্ত করে থাকে। উভয়ের মাঝে প্রেম-প্রীতির অঙ্গীকার নবায়ন করা হয়। একে অন্যকে প্রীতির সাদর সম্ভাষণ জানায়।

এই দিনে প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে গ্রীটিং কার্ড বিনিময় করা হয়। সেই কার্ডে লিখা থাকে (Be My Valentine) অর্থাৎ, আমার ভ্যালেনটাইন হয়ে যাও। লিখা থাকে প্রেমের নানা কবিতা, গান, শ্লোক বা ছোট বাক্য।

প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে লাল ফুল (গোলাপ) বিনিময় করা হয়।

প্রেমিক-প্রেমিকার মাঝে কেক, মিঠাই ও চকলেট বিতরণ করা হয়।

এই দিনে ময়রারা লাল রঙের মিষ্টি (বা কেক) তৈরী করে। তার উপরে প্রেমের প্রতীক হৃদয় অঙ্কন করে।

গ্রীটিং-কার্ডে, উৎসব-স্থলে অথবা অন্য স্থানে প্রেমদেব (Cupid)-এর ছবি বা মূর্তি স্থাপিত হয়। আসলে তা হল একটি ডানা-ওয়ালা শিশু; তার হাতে আছে ধনুক এবং সে প্রেমিকার হৃদয়ের প্রতি তীর নিশান লাগিয়ে আছে।

এই দিনে প্রেমিক-প্রেমিকারা আনন্দ প্রকাশার্থে পথে-পার্কে-ময়দানে বের হয়। জমায়েত হয় নাইট ক্লাব ও বিভিন্ন হোটেলে। চলে ড্রিঙ্ক, ড্যান্স্ ও ব্যভিচারের বিরাট ধুম!

আপনি যদি সত্যিকার মুসলিম হন, তাহলে আপনিই বলুন না, এমন চরিত্র-বিনাশী উৎসব কি কোন মুসলিম যুবক-যুবতী পালন করতে পারে?

একজন মুসলিম কি বিবাহের পূর্বে কোন নারীর সাথে অবৈধ প্রণয় ও সম্পর্ক গড়তে পারে?

একজন মুসলিম কি কোন বিজাতির উৎসবে আনন্দিত হতে পারে?

একজন মুসলিম কি নিজস্ব স্বকীয়তা বিকিয়ে পরের ছাঁচে গড়তে পারে?

যেহেতু তার নবী যে বলেছেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির আনুরূপ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই একজন।" *(আহমাদ ২/৫০, আবূ দাউদ ৪০৩১, সহীহুল জামে' ৬০২৫ নং)*

পর্যায়ভুক্ত। যেহেতু যে কোনও কর্ম দ্বারা মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে অথচ তা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত না থাকে, তা বিদআত বলে পরিগণিত হয়। *(মাজমূউ ফাতাওয়া, ইবনে উষাইমীন ২/৩০০, আল-মুমতে' ৫/১৪৮)*

পক্ষান্তরে যদি কেবল পার্থিব দিক খেয়াল করে ঐ সকল কর্মে মানুষকে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে পার্থিব কোন আচার-অনুষ্ঠান করা হয়, তাহলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে না।

হানিমুন ও বিবাহ-বার্ষিকী

বিবাহ-বার্ষিকী বা বিবাহের তারীখে প্রত্যেক বছর দম্পতির নির্দিষ্ট আনন্দোৎসব পালন করা ইসলাম বহির্ভূত কর্ম। স্বামী-স্ত্রীর সাজ-সজ্জার সাথে আনন্দ করা কোন দোষের কথা নয়। দোষ হল নির্দিষ্ট করে বিবাহের দিনে প্রত্যেক বছর সেই প্রথা পালন করা, যা সাধারণতঃ বিজাতির। আর তাতে রয়েছে বিজাতির অন্ধ অনুকরণ; যা হারাম। *(দেখুন ঃ মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ২/৩০২)*

তদনুরূপ হানিমুন পালন করার প্রথাও। যাতে বিবাহের পরবর্তী প্রথম সপ্তাহ (অথবা এক সপ্তাহেরও বেশী দিন) নব-দম্পতী আত্মীয়-স্বজন হতে দূরে থেকে ছুটি উপভোগ করে; যাতে রয়েছে অস্বাভাবিক খরচ এবং অপব্যয়।

হাল খাতা বা নতুন খাতা

অনেক জাহেল মুসলিম ব্যবসায়ী মনে করে অথবা প্রতিবেশীর দেখাদেখি বিশ্বাস রাখে যে, দোকান খোলার সময় ধূপ-ধুনো দিলে, দাঁড়িপাল্লায় ও দরজায় পানি ছিটালে, প্রথম বিক্রয়ের টাকা কপালে ঠেকিয়ে সালাম করলে, দোকানে কোন তাবীয, কুরআনের আয়াত, কারো মূর্তি অথবা ছবি টাঙ্গিয়ে রাখলে দোকান ভালো চলবে বা খদ্দের বেশী হবে।

অনেক দোকানদার বিভিন্ন বিষয়কে তার দোকান ও ব্যবসার জন্য অশুভ

মনে করে থাকে; যেমন প্রথম খদ্দের অমুক এলে সারাদিন ভালো যাবে না, প্রথমে দোকান খুলতেই বইনি না করে ধার দেওয়া যাবে না। ইত্যাদি।

তদনুরূপ নববর্ষের শুরুতে 'হাল খাতা' বা 'নতুন খাতা' খোলার মাধ্যমে নববর্ষ উদ্‌যাপন করার সময় আমপাতা ও সিন্দুর দিয়ে দোকান সাজানো, মীলাদ পড়ানো, মিষ্টি বিলানো ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে দোকানের বর্কতের আশা অথবা অধিকাধিক বেচা-কেনার আশা শির্ক ও বিদআত।

নিঃসন্দেহে ঐ সকল কাজের মধ্যে শির্ক ও বিদআত রয়েছে; যা কোন মুসলিম করতে পারে না।

মুসলিমের একমাত্র ভরসাস্থল তার প্রতিপালক মহান আল্লাহ। তিনিই একমাত্র রুযীদাতা। তাঁরই কাছে রুযী চাওয়া উচিত এবং সকল আশা তাঁরই কাছে করা উচিত।

যদি কেউ বলেন, 'এই অবসরে ধার-বাকী আদায় করা সুবিধা হয়' তাহলে আমরা বলব যে, তা বলে সেই সুবিধা লাভের জন্য শির্ক বা বিদআত তো করা যায় না। অবশ্যই আপনার অর্থের থেকে আপনার ঈমানের মূল্য অনেকানেক বেশী। অন্য কোন পার্থিব পদ্ধতিতে ঋণ পরিশোধ নেওয়ার ব্যবস্থা খুঁজুন। আল্লাহ আপনার ব্যবসায় বর্কত দিন।

ফারেগী অনুষ্ঠান

আলেম-হাফেয-ক্বারী ফারেগ হওয়া উপলক্ষে সনদ-সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য যে অনুষ্ঠান করা হয়, তা আসলে ঈদের পর্যায়ভুক্ত নয়। যেহেতু তা ফারেগীদের জন্য প্রত্যেক বছর ফিরে ফিরে আসে না। তা ছাড়া তার উপলক্ষ্যটা বর্তমানের সাথে সম্পৃক্ত, কোন অতীতের সাথে নয়। অতএব তা ঈদের মত নয়। *(আল-মুমতে' ৫/১৪৮)* সুতরাং তা বিদআত বলা যাবে না।

অবশ্য ফারেগী ছাত্রদের জন্য সকলের হাত তুলে জামাআতী দুআ বিধেয় নয়।

'জশ্নে বুখারী'তে ওস্তাদ-ছাত্র ও মাদ্রাসার কমিটি মিলে খাস বৈঠক করে বুখারীর শেষ হাদীস পড়ে খতমের বিশেষ অনুষ্ঠান এবং সবশেষে সকলের হাত তুলে দুআ ও মিষ্টি বিতরণ প্রথা ফারেগী মাদ্রাসাগুলোতে প্রচলিত। এ প্রথা যদি কেবল মিষ্টি খাওয়ার উপর যথেষ্ট হত, তাহলে হয়তো কিছু বলা যেত না। কিন্তু অনুষ্ঠান করে বুখারীর শেষ হাদীস পড়া এবং হাত তুলে সকলের দুআ করা বিদআতরূপে সূচিত। তাই তা বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

নবান্ন উৎসব

হৈমন্তী ধান কাটার পর অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠেয় নূতন চাল (নতুন চালের ভাত, এঁকে (পিঠা, ক্ষীর) খাওয়ার (ও বিতরণ করার) উৎসব কিছু নামধারী মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত আছে। অথচ এটি একটি বিজাতীয় প্রথা।

পক্ষান্তরে ইসলামের নিয়ম হল, নতুন ফল-ফসল দেখে রুযীদাতা মহান প্রতিপালক আল্লাহর কাছে এই বলে দুআ করা ঃ-

[illegible]

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-রিক লানা ফী সামারিনা, অবা-রিক লানা ফী মাদীনাতিনা, অবা-রিক লানা ফী সা-ইনা, অবা-রিক লানা ফী মুদ্দিনা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের ফল-ফসলে, শহরে ও পরিমাপে বর্কত দান কর। *(মুসলিম ১৩৭৩নং)*

কিন্তু আনন্দ উপভোগ করার মানসে বিজাতির প্রথাকে ভালো মনে করে পালন করে থাকে এমন উৎসব; যা সত্যই দুঃখজনক।

পৌষপার্বণ

এটি পৌষসংক্রান্তিতে (প্রধানতঃ নূতন চাউলে) পিষ্টকাদি প্রস্তুত করে দেবতাকে নিবেদন করার উৎসব। সুতরাং এ উৎসবে কোন মুসলিমকে উৎসাহিত হতে দেখা এবং নিজ ঘরে নানা রকম পিঠা প্রস্তুত করে খেয়ে

আনন্দবোধ করা আশ্চর্যের কথাই বটে। পৌষ মাসকে বিদায় দেওয়ার মানসে শাঁক (শঙ্খ) বাজিয়ে শাঁকরাত পালন করে থাকে অনেক নামধারী মুসলমান। খুশী করার মানসে চোখ বন্ধ করে বিজাতির অনুকরণ কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

তা বলে পিঠে খাওয়া যে মানা তা বলছি না। পিঠা তো যে কোন দিনে খাওয়া যায়। তাহলে ঐ দিনে কেন?

বিবিধ পরব

বিজাতির অন্ধ অনুকরণে অনেক মুসলিম আরো অনেক পরব পালন করে থাকে। যেমন গরু পরবের দিন গরু-ছাগলের গায়ে রঙ্গিন ছাপ দেয়। ভাইফোঁটার দিন কপালে ফোঁটা দেয়। রাখীবন্ধনের দিন হাতে রাখী বাঁধে। বিশ্বকর্মার দিনে লৌহনির্মিত মেশিন ও গাড়ি ইত্যাদি বন্ধ রাখে এবং কেউ কেউ কোন কোন আচারও করে থাকে।

পালন করে থাকে এপ্রিল-ফুল, হ্যালোইন উৎসব, বসন্ত উৎসব প্রভৃতি। সোৎসাহে শরীক হয়ে থাকে এ সব বিজাতীয় পর্বে। যেহেতু তারা হল ধর্মনিরপেক্ষ তাই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে অনেক মুসলিম দাবী করে থাকে, কিন্তু এক এক মানুষ ধর্মনিরপেক্ষের অর্থ এক এক রকম নিয়ে থাকে। আর তাতেই নিহিত থাকে তার ঈমানের পরিচয়।

(১) ধর্ম নিরপেক্ষ মানে ঃ ধর্মহীনতা; ধর্ম বলে কিছু নেই। কোন ধর্মই পালন করা যাবে না। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' ধর্ম থাকলে, তা হল একটিই; তা হল বিশ্বমানবতার ধর্ম। এই বিশ্বাসে অনেকে ইসলামকেও আল্লাহর মনোনীত ধর্ম বা দ্বীন নয় বলে বিশ্বাস রেখে কাফের হয়ে যায়। এরা রাজনৈতিক স্বার্থে যাচ্ছেতাই করতে পারে। তবে এরা একেবারে যে ধর্মীয় কোন আচার পালন করে না তা নয়। বরং সমাজচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় অথবা ভোট

পাওয়ার লোভে কোন কোন সময় টুপী লাগিয়ে মসজিদে, বিবাহ-মজলিসে, জানাযায়, মীলাদে, মাযারে, কখনো বা গীর্জায় ও মন্দিরেও দেখা যায়। রোযা না রাখলেও ইফতারী পার্টি অবশ্যই করে। আর এদের জন্য সব ধর্মের পরব পালন করা আশ্চর্যের কিছু নয়। এরা কখনো জালসার সভাপতি, কখনো পূজা-কমিটির সদস্য অথবা সেক্রেটারী আবার কখনো বা যাত্রা-থিয়েটারের পরিচালক হয়ে গর্ববোধ করে থাকে। আসলে এরা হল বহুরূপী।

(২) ধর্মনিরপেক্ষ মানে ঃ সব ধর্ম সমান, সব ধর্মই সত্য। ইসলাম আসার পরেও সব ধর্মই স্বস্থানে সত্য। যে কোন ধর্মের অনুসারী হয়ে বেহেশ্তে বা স্বর্গে যাওয়া যায়। এই শ্রেণীর মানুষরা মনে করে ওদের ধর্মীয় আচারে এদের এবং এদের ধর্মীয় আচারে ওদের অংশগ্রহণ করা চলবে, বরং সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য অংশগ্রহণ করা উচিত।

এই শ্রেণীর ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ আসলে কুরআনকে অস্বীকার করে। কারণ কুরআন বলে,

﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ﴾ (آل عمران ١٩)

অর্থাৎ, “নিশ্চয় আল্লাহর মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম।” *(আলে-ইমরান ১৯ আয়াত)*

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ ﴾

অর্থাৎ, “যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। *(সূরা আলে-ইমরান ৮৫ আয়াত)*

“বল, হে কাফেরদল! আমি তার উপাসনা করি না, যার উপাসনা তোমরা কর। তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। আমি তার উপাসক হব না, যার উপাসনা তোমরা কর। আর তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের এবং আমার ধর্ম আমার (কাছে প্রিয়)।” *(সূরা কাফিরূন)*

(৩) ধর্মনিরপেক্ষ মানে ঃ ইসলাম ধর্ম হল সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহান আল্লাহর মনোনীত

ধর্ম। ধর্ম বিষয়ে কোন বাড়াবাড়ি নেই, জোর-জবরদস্তি নেই, সাম্প্রদায়িকতা নেই। অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করতে পারে মুসলিম। অন্য ধর্মকে গালি দিতে পারে না। নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখে অপরকে হেদায়াতের পথ দেখিয়ে সওয়াব লাভ করতে ভুল করে না।

এমন অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু কোন শির্কী বা বিদআতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

সমাপ্ত